কুলবধূ

[সামাজিক উপন্যাস]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ভাদ্র—১৩২৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

Printed by P. N. Mukherjee
at the Preo-Printing Works.
30, Beadon Street Calcutta.
1916.

Published by
J. N. Bose.
29, Durga Charan Mittra Street,
CALCUTTA.

উপহার।

আমার

কে

এই পুস্তকখানি

স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

শ্রী

তারিখ

দু একটী কথা।

বাণীর কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া এতদিন কেবল শুধু আগাছাই পরিষ্কার করিয়া আসিতেছিলাম,—মাতৃ-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্ঘ প্রদানে সাহস বা স্পর্দ্ধা হয় নাই। মায়ের করুণায় আজ প্রথম অর্ঘ লইয়া মাতৃ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছি। জানি না, জননী চরণে অর্ঘ লইবেন কিনা; কিন্তু মা যে আমার করুণাময়ী—সন্তানের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই তাঁহার উপেক্ষার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে না। "কুলবধূ" বঙ্গকুলবধূর স্নেহাঞ্চলে স্থান পাইবে।

হাস্যমাখা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি

স্নেহময়ী শ্রীমতী ক্ষেতুরাণী পাল

শ্রীচরণকমলেষু।

সেজবৌদি,

তোমারই আদর্শে "কুলবধূ" রচিত হইয়া মায়ের চরণে অর্পিত হইল! জানিনা কুলবধূ মায়ের আশীষ লাভে সক্ষম হইবে কি না। তুমি কুলবধূ—তোমার নিকট নিশ্চয়ই "কুলবধূর" মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। তাই "কুলবধূ" তোমারই নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম।

স্নেহাস্পদ—

যতীন।

কুলবধূ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবরত্ন পুষিতে বিক্রমাদিত্যের যে বিলক্ষণ দু'পয়সা ব্যয় হইত এ কথা ইতিহাসে বিশেষ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ না থাকিলেও গৌরীশঙ্কর রায়ের বিস্তৃত বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর প্রবেশ করিলেই কথাটা অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইত। ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ যেমন নবরত্নের এক একটী রত্ন-রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কেবলি জ্ঞানালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন; সেইরূপ রামজীবনপুরের বিখ্যাত মাতব্বরগণ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গৌরীশঙ্কর রায়ের বৈঠকখানা বাটীতে জড় হইয়া কেবলই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দলাদলি লইয়া রীতিমত আসর জমাইয়া তুলিতেন। ইহাতে যে রায় মহাশয়ের বিলক্ষণ দু'পয়সা ব্যয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারে কোনরূপ কাজ না থাকায়,—সময় কাটিতে চায় না, কাজেই বিক্রমাদিত্যের ন্যায় রায় মহাশয়কেও এই ব্যয়ভারটুকু বহন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

গৌরীশঙ্কর রায়ের পৃথিবীতে থাকিবার মধ্যে ছিল বিস্তৃত জমিদারী ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম একমাত্র পৌত্র। নাতি অখিলচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া কেবলি পাশ করিতেছিলেন, আর ঠাকুরদাদা রায় মহাশয় তাঁহার জমিদারীতে থাকিয়া কেবলই মামলা চালাইতেছিলেন। মামলার শেষ না থাকিলেও পাশের একটা শেষ আছে। সম্প্রতি পাশ করা শেষ হইয়া যাওয়ায় অখিলচন্দ্রকে স্বগ্রামে ফিরিতে হইয়াছে।

আষাঢ়ের সন্ধ্যাটা রায়েদের বৈঠকখানায় প্রত্যহ যেমন জমিয়া উঠে, আজ এখনও সেরূপ জমিয়া উঠে নাই। যাত্রা বসিবার পূর্ব্বে যাত্রার অধিকারিগণ যেমন আক্‌ড়া দিতে থাকে, সেইরূপ কেবল ভট্টাচার্য্য খুড়া ও রসিকমোহন, রায় মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া মওড়া দিতেছিল। ভট্টাচার্য্য খুড়া উবু হইয়া বসিয়া 'পূজা আহ্নিক করিলে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি করে', তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা রায় মহাশয়কে শুনাইতেছিলেন, আর রসিকমোহন বিফল চেষ্টায় তাঁহার হস্ত হইতে হুকাটা লইবার জন্য বার বার হাত বাড়াইতেছিল। হুকার নলিচাসংবদ্ধ কড়িটা ভট্টাচার্য্য খুড়ার সাবধানতায় ক্রমাগত নড়িয়া সে যেন রসিকমোহনকে বলিতেছিল,—"আরে অত ব্যস্ত হও কেন,—একটু সবুর কর না।"

সেই সময় অখিলচন্দ্র সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অঙ্গের সুচিক্কণ টেনিস্ সার্টটা আষ্টে-পৃষ্টে কাদার দাগ খাইয়া যেন বৃন্দাবনের নামাবলীর ভাব গ্রহণ করিয়াছে, পশ্চাতে

ভৃত্য পদ্মলোচন। তাহার এক হস্তে চায়ের বাক্স ও অন্য হস্তে বাবুর হুইল বাঁধা প্রকাণ্ড ছিপ্। অখিলচন্দ্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রসিকমোহনের প্রখর দৃষ্টি যেন তাহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য বাহিরে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিল। ভট্টাচার্য্য খুড়ার অমন জমাটী সার জিনিষগুলা একেবারে অসার হইয়া গেল। ফরাসের উপর হইতে সমস্ত শব্দ ভেদ করিয়া রসিকমোহনের স্বর উঠিল,—"এই যে ছোটবাবু—আসুন! আমরা আপনারই কথা বলাবলি করছিলেম।"

ভট্টাচার্য্য খুড়া তাঁহার সারগর্ভ কথাগুলা মাঝ রাস্তায় মারা যায় দেখিয়া একটু বিরক্ত ভাবে হাতের হুকাটায় জোর জোর কয়েকটা টান মারিয়া কেবলি ধোঁয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কথাগুলা ধরিয়া রাখিবার জন্য ধোঁয়া দিয়া চাপা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু ধোঁয়া বাগ মানিল না, মুখবন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাহা নাসিকা পথে ভর ভর করিয়া বাহির হইতে লাগিল। কথাগুলা বোধ হয় সেই তাম্রকূট ধূমের সহিত পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল; তিনি থেই হারাইলেন, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলেন,—"বাবাজীর এইবার একটা বিবাহ বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কি বলেন রায় মশাই?"

অখিলচন্দ্র তখন তাঁহার ঠাকুরদাদার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। রায় মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ভট্চাজ্! আমিতো সব ঠিক ঠাক করে ফেলেছিলেম, ভায়া যে আমার কিছুতেই বাগ মানছেন না। ভায়ার আমার বিদ্ঘুটে সখ,—

উনি কিছুতেই বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করবেন না। ওঁর বিশ্বাস বড়লোকের মেয়েগুলো একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকে। উনি চান একটী গরীবের মেয়ে; কিন্তু তা বলেতো একটা হাঘুরের মেয়েকে ঘরে আন্‌তে পারি না; অন্ততঃ বংশটাও ভাল হওয়া চাই তো। কাজেই দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। ভায়ার যে এখন একটা বিয়ে বিলক্ষণ দরকার,—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?"

রসিকমোহন মুখখানা হাসি হাসি করিয়া বলিল,—"বড়কর্ত্তা! কি বংশের ছেলে! ছোটবাবুর প্রাণটা যেন পালতোলা জাহাজ।"

রসিকমোহনের কথায় বড় একটা কেহ কান দিল না। অখিলচন্দ্র তাঁহার ঠাকুরদাদার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দাদা-মশাই সে বিষয়ে সন্দেহ অনেক। বিয়েটা আহারের মত এমন কিছু দরকারী জিনিষ নয়, যে না হ'লে মানুষ বাঁচতে পারে না। বিয়েটা কতকটা স্নগন্ধ, পাউডার, সাবান, তাম্বুলবিহার প্রভৃতির মত—না হ'লেও চলে; তবে হ'লে মন্দ হয় না।"

গৌরীশঙ্কর রায় এক গাল হাসিয়া বলিলেন,—"ভায়া! যখন হ'লে মন্দ হয় না, তখন হওয়াই উচিত।"

অখিলচন্দ্র হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তা বলে যার বার ইঞ্চি ছাতি সে যদি ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতির জামা গায়ে দেয়, তা হ'লে তাকে লোকেও বিচ্ছিরী বলে, নিজেরও বিচ্ছিরী ঠেকে।"

রায় মহাশয় তাঁহার পৌত্রের পৃষ্ঠে সস্নেহে কয়েকটা চপেটা-ঘাত করিয়া বলিলেন,—"ভায়া, তোমার ছত্রিশ ইঞ্চির জামা

পরে কাজ নেই। আমি তোমার মনের মতনই একটী লাল টুকটুকে দিদিমণি ঘরে আনবো।"

ভট্টাচার্য্য খুড়া তাঁহার টিকিটা বার দুই সজোরে নাড়িয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"বিবাহটা সম্পূর্ণই প্রজাপতির হাত। শাস্ত্রে আছে—"

রসিকমোহন বাধা দিয়া বলিল,—"খুড়ো সব যায়গায় কি আর তোমার শাস্ত্র চলে। প্রজাপতির হাত,—কিসে প্রজাপতির হাত? একি নফ্‌রা কলুর বিয়ে যে প্রজাপতির হাত! টাকা হ'লে প্রজাপতির ডানা কেটে দেওয়া যায়—তা হাত।"

কথাটা প্রতিবাদ করিবার জন্য ভট্টাচার্য্য খুড়া রীতিমত প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বড় বড় শ্লোক মনে মনে আওড়াইয়া রঙ্গভূমির অভিনেতার ন্যায় মহলা দিতে ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল, তিনি হুকাটা নামাইয়া আস্ফালন করিয়া উঠিবামাত্র রায় মহাশয় বলিলেন,—"সে কথা থাক, তারপর ভায়া আজ মাছটাছ একটা গাঁথ্‌তে পারলে?"

অখিলচন্দ্র তাঁহার সাটটার দিকে একবার চাহিয়া একটু করুণস্বরে বলিলেন,—"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদামশাই! তুমিও যেমন কৃপণ, তোমার পুকুরের মাছগুলোও ঠিক তোমারই মত। লোকের কষ্ট কিংবা সখ্‌ তারা কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না। তা ছাড়া নিজেদের পুকুরে মাছ ধরে কোন আনন্দই নেই।"

রসিকমোহন একটু উচু হইয়া অখিলচন্দ্রের মুখের নিকট

ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"ছোটবাবু যথার্থ কথাই বলেছেন। নিজের টাকা খরচ করে কি আর সুখ আছে, সুখতো পরের টাকা খরচ করে। তা ছোটবাবু এক কাজ করুন না কেন,—কাল থেকে "রাণীগড়ে" মাছ ধরতে যান। পঁচিশটা টাকা খরচ করে এক মাসের জন্য পাস করুন,—মাছ ধরে আরাম পাবেন। বড় বড় রুই, কাতলা, মিরগেল ব্যাঙাচির মত কিল-বিল কচ্ছে।"

রামজীবনপুরে দুই ঘর জমিদারের বাস। দুই ঘরেরই সমান প্রতিপত্তি, কেহ কাহারও অপেক্ষা খাটো নহেন। এক ঘর রায় ও অপর ঘর বসু। বসু বংশের রতন বোস একটীমাত্র কন্যা রাখিয়া মারা যাওয়ায়, তাঁহার সমস্ত জমিদারী এক্ষণে তাঁহার বিধবা পত্নীর হস্তে রহিয়াছে। বসুদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। এই দীঘিটার নাম "রাণীগড়",—রাণীগড় বসুদিগের সম্পত্তি। বৎসরে কয়েক মাস সকলকেই এই দীঘিটায় মাছ ধরিবার জন্য পাস বিতরণ করা হয়। মাছের জন্য এই দীঘিটা প্রসিদ্ধ,—এত মাছ এ অঞ্চলে আর কোন পুকুরেই নাই। কেবল পাস বিতরণ করিয়া বৎসরে এই দীঘিটা হইতে বসুদিগের তিন চারি শত টাকা আয় হয়। রাণীগড়ের নাম শুনিয়া রায় মহাশয় রসিকমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাণীগড়ে মাছ ধরবার জন্য বোসেরা পাস করেছে নাকি হে?"

রসিক যেন একটু বিস্মিতের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—

বড়কর্ত্তা তা জানেন না নাকি! আজ ক'বৎসর থেকেই তো পাস দিচ্ছে। সদর থেকে সাহেব মেমরা পর্য্যন্ত মাছ ধরতে আসে।"

কর্ম্মশূন্য সঙ্গীশূন্য অখিলচন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া অবধি কেবলি মাছ ধরিয়া ফিরিতেছিলেন,—এ পুকুর সে পুকুর, নানা পুকুর ঘুরিয়াও তিনি অদ্যাপি একটী মৎস্যও বড়শিতে গাঁথিতে পারেন নাই। রসিকের মুখে রাণীগড়ের নাম শুনিয়া, 'কিলবিল' মাছের কথায় তাঁহার রাণীগড়ে ছিপ্ ফেলিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ঠাকুরদাদাকে ধরিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"দাদামশাই আমি রাণীগড়ে মাছ ধর্‌তে যাব,—কাল সকালেই তার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া চাই।"

পৌত্র রাণীগড়ে মৎস্য ধরিতে চাওয়ায় বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর রায়ের মুখখানা একটু অপ্রসন্ন হইল। পাশাপাশি দুই ঘর জমিদার হওয়ায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বংশ পরম্পরায় একটা না একটা বিষয় লইয়া কেবলই মামলা চলিয়া আসিতেছিল। উভয়ের মধ্যে পরস্পরে মুখ দেখাদেখি ছিল না, একে অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য সতত উদ্গ্রীব। এ অবস্থায় কি করিয়া তিনি তাঁহার নাতিকে বোসেদের দীঘিতে মাছ ধরিতে যাইতে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন! রায় মহাশয় একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ভায়া বোসেদের সঙ্গে আমাদের চির বিবাদ, এ অবস্থায় বোসেদের দীঘিতে মাছ ধর্ত্তে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়।"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"এতে আর ভাল মন্দ

দেখার কি আছে বড়কর্ত্তা! টাকা দিয়ে মাছ ধরবো, অনুগ্রহ তো নয়।"

অখিলচন্দ্রও রসিকের সুরে সুর মিলাইয়া একেবারে জেদ ধরিয়া বসিলেন, তিনি একেবারে নাছোড়-বান্দা। কাজেই বাধ্য হইয়া রায় মহাশয়কে অনুমতি দিতে হইল, বলিলেন,—"ভায়া বল আমি কবে তোমার কোন সাধটা অপূর্ণ রেখেছি।"

তারপর রসিকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"রসিক, কাল তাহ'লে সকালে পঁচিশটা টাকা নিয়ে ভায়ার মাছ ধরবার বন্দোবস্তটা করে দিও।"

রসিকমোহন তাহার করদ্বয় কচ্‌লাইয়া বলিল,—"আজ্ঞে আর বল্‌তে হবে না। এগারটার মধ্যে—বুঝলেন ছোটবাবু, দেখবেন একেবারে মাচান টাচান বাঁধা ঠিক ঠাক।"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছিল। রাত্রি এক প্রহর জ্ঞাপন করিয়া বাহিরে শৃগালগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অখিলচন্দ্র মাছ ধরিবার চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার অঙ্গের সমস্ত দিনের ধুলা মাটী পরিষ্কার করিবার জন্য বাটীর ভিতর প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাসি কান্নার মধ্য দিয়া আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নটা আপন মনে কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সে যেন কোন নিয়মের ধার ধারে না। খল্ খল্ হাসিয়া এই প্রদীপ্ত রৌদ্রে চারিদিক দগ্ধ করিতেছিল, আবার পরক্ষণেই চোখের জলের বড় বড় ফোটায় বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া তুলিতেছিল। অখিলচন্দ্র তাঁহার হুইল বাঁধা প্রকাণ্ড ছিপ্‌টা ধরিয়া একদৃষ্টে ফাত্‌নার পানে চাহিয়া দীঘির এককোণে বসিয়া এই আষাঢ়ের মধ্যাহ্নটার সৎব্যবহার করিতেছিলেন। দূরে ব্রহ্মনিয়ে ভৃত্য পদ্মলোচন বাবুর চার্-টার, মৎস্য ধরিবার সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক করিয়া দিয়া গামছাটা মস্তকের উপাধান করিয়া বহুক্ষণ হইতেই নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। অখিলচন্দ্রের দৃষ্টি সে দিকে নাই, তিনি একবার করিয়া ছিপটা তুলিতেছিলেন আর বড়শি দুইটাতে টোপ পরাইয়া আবার তাহা জলে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আজ তিন দিন তিনি রাণীগড়ে ছিপ ফেলিতেছেন; কিন্তু মাছতো দূরের কথা একখানি আঁসও গাঁথিয়া তুলিতে পারেন নাই। দীঘিতে মৎস্যের অভাব নাই, চারেও মাছ জমিয়াছে,—মাছে টোপও ধরিতেছে কিন্তু টানটা একটু আগে, একটু পরে হওয়ায় সব গোলযোগ

হইয়া যাইতেছিল। অখিলচন্দ্রের বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও টানটা কিছুতেই ঠিক সময় মত ঘটিয়া উঠিতেছিল না, কিন্তু আয়োজনের কোনই অভাব নাই, কুড়া অনবরত পড়িতেছে, টানেরও বিরাম নাই।

সহসা পুকুরের পাড়ের উপর হইতে অতি মধুর হাসির খিল খিল শব্দ অখিলচন্দ্রের কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিলেন। দেখিলেন, একটী বালিকা পুকুরের পাড়ের উপর একটা নারিকেল বৃক্ষের গুড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া মুখে অঞ্চল গুজিয়া এক অপরূপ ভঙ্গিমায় খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। বালিকার রংটা কাঁচা সোণার মত না হইলেও গৌরবর্ণ বটে। তাহার মাথার এলো মেলো কাল চুলের রাশ কুঞ্চিত হইয়া মুখে চক্ষে পৃষ্ঠে গড়াইয়া জানু পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। কৈশোর-যৌবন মেশামিশি হইয়া যমুনা-জাহ্নবীর ন্যায় তাহার সমস্ত দেহটা বেষ্টন করিয়া যেন আকুল উচ্ছ্বাসে তোলপাড় করিতেছে। সব চেয়ে সৌন্দর্য্য তাহার অপরূপ বড় বড় চক্ষু দুইটির। তাহা যেন বিশ্বকর্ম্মার বহু যতনের, বহু সাধনার ফল। অখিলচন্দ্র ফিরিবামাত্র বালিকার চক্ষু দুইটি তাঁহার চখের সহিত মিলিত হইল, বালিকা হাসিয়া একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। নির্জ্জন দীঘির পাড়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্নে এই অপরূপ বালিকার, এই অপরূপ হাসি অখিলচন্দ্রকে যেন হতভম্ব করিয়া দিল। তাঁহার মনে হইল, এই এত বড় আকাশের মাঝখানে, এই বিস্তৃত বিশ্বে কেবল এই সুন্দর কোমল মুখখানি একটী মাত্র দেখি-

বার জিনিষের মত তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে। বালিকা সহসা তাহার হাসির বেগ একটু দমন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"টানুন—টানুন—ফাত্‌না ডুবিয়েছে।"

অখিলচন্দ্র ফিরিলেন, সত্বর গোঁজার উপর হইতে তাঁহার ছিপ গাছটা তুলিয়া লইয়া সজোরে টান মারিলেন। কিন্তু মাছ কোথায়? স্থানটি কাদায় পিছল হইয়াছিল, তিনি তাল সামলাইতে না পারিয়া নিজেই উল্টাইয়া পড়িলেন। বালিকার উচ্চ হাসিতে সমস্ত দীঘির পাড় প্রতিধ্বনিত হইয়া মধুময় হইয়া গেল। অখিলচন্দ্র মনে মনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—"হাস্‌ছ যে! এতে হাস্‌বার কি আছে! পা পিছ্‌লে গেলেই মানুষ পড়ে থাকে।"

হাসিয়া হাসিয়া বালিকার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে হাসির ভিতর দিয়া কোনক্রমে উত্তর দিল,—"মানুষ পড়্‌লেই লোকেও হেসে থাকে।"

অখিলচন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না,—তিনি বিশেষ বিরক্তভাবে মুখখানা ভারি করিয়া আবার নিজের মনে বড়শিতে টোপ পরাইতে লাগিলেন। বালিকা পুকুরের পাড়ের উপর বসিয়া অখিলচন্দ্রের মৎস্য শীকার দেখিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা নীরব নিস্তব্ধ—সহসা অখিলচন্দ্রের একেবারে কর্ণের নিকটে বালিকার হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। কাজেই অখিলচন্দ্রকে আবার ফিরিতে হইল; দেখিলেন, বালিকা এবার একেবারে তাঁহার

পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিকার আচরণে অখিলচন্দ্র সত্যই বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তুমি আবার এখানে এলে কেন?"

বালিকা অতি তাচ্ছিল্য ভাবে বলিল,—"কেন আস্‌বো না, এ কি তোমার কেনা পুকুর?"

অখিলচন্দ্র বিরক্তভাবে কহিলেন,—"কেনা পুকুর না হতে পারে, কিন্তু আমি রীতিমত টাকা দিয়ে পাশ করিয়ে তবে মাছ ধর্ত্তে এসেছি।"

বালিকা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল,—"বড় কাজই করেছ! পাশ করেছ মাছ ধরবার, ধারে কেউ দাঁড়াবে না তার তো আর পাশ করনি।"

অখিলচন্দ্র এবার বেশ একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তোমার গোলমালে আমার চার থেকে যদি মাছ পালায় তাহ'লে কিন্তু ভাল হবে না বল্‌ছি।"

বালিকা অবজ্ঞাভরে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও ভারি তো আমার মাছ ধরিয়ে, তার আবার চার। তুমি যা মাছ ধর্ত্তে জান তা এক টানেই বোঝা গেছে।"

"পুকুরে যদি মাছ থাক্‌তো তো বুঝিয়ে দিতুম মাছ ধর্ত্তে জানি কি না," বলিয়া অখিলচন্দ্র মুখখানা বেশ একটু ভারি করিয়া আবার যাইয়া ছিপ ধরিয়া বসিলেন। বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেই বই কি? এতো আর রায়েদের ডোবা নয়।"

বালিকার কথার খোঁচা খাইয়া অখিলচন্দ্র ছিপ ফেলিয়া অবাক হইয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন! তবে কি বালিকা তাঁহাকে চিনে! তিনি কথাটার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু দেখিলেন প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে আরও খেলো হইতে হয়। মৎস্য থাকুক আর নাই থাকুক্ তিনি যখন নিজেদের পুকুর ছাড়িয়া বন্ধুদের দীঘিতে মাছ ধরিতে আসিয়াছেন তখন আর সে কথায় তর্ক চলে না। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সে কথা চাপা দিয়া বলিতে হইল, "তবে মাছ খায় না কেন? চারও ফেলা হয়েছে, টানও মারছি—মাছ না উঠ্‌বার কারণ কি?"

বালিকা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কারণ তুমি মোটেই মাছ ধ'র্ত্তে জান না!"

বালিকার কথার ভঙ্গিমায় অখিলচন্দ্র না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমিতো মোটেই জানি না—তুমি তো জান।"

বালিকা গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা তোমার চেয়ে ঢের ভালো জানি।"

অখিলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই হুইল বাঁধা প্রকাণ্ড ছিপটা বালিকার হস্তে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ধর দেখি মাছ, দেখি তোমার কি রকম বাহাদুরী।"

বালিকা সটান সেই হুইল বাঁধা প্রকাণ্ড ছিপটা অখিলচন্দ্রের

হাত হইতে তুলিয়া লইল, গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাজী! যদি মাছ ধর্ত্তে পারি কত বাজী হারবে বল!"

অখিলচন্দ্র একবার তাঁহার সার্টের পকেটে হস্ত দিলেন কিন্তু তথায় কিছুই নাই। তিনি হটিবার পাত্র নহেন বলিলেন, "এই আমার আংটী বাজী। যদি তুমি মাছ ধরতে পার এই আংটী তোমায় খুলে দিয়ে যাব।"

বালিকা বলিল, "আমি যদি মাছ না ধর্ত্তে পারি, তবে আমার এই হার তোমায় দিয়ে দেব।"

মহা আস্ফালনে বাজী রাখিয়া বালিকা ছিপের বড়শি দুইটা অখিলচন্দ্রের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"দাও দেখি টোপ গেঁথে—একটায় কেঁচো, একটায় ময়দা।"

অখিলচন্দ্র নীরবে বড়শি দুইটাতে টোপ গাঁথিয়া দিলেন, বালিকা ছিপটা জলে ফেলিতে যাইয়া বড়শির দিকে চাহিয়া আবার হাসিয়া উঠিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল,"ওমা তুমি মোটে টোপ গাঁথ্‌তেই জান না,—তুমি এসেছ মাছ ধর্ত্তে?"

অখিলচন্দ্র আর কোন কথা খুজিয়া পাইলেন না, তিনি মহা অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে বালিকার দিকে চাহিতে লাগিলেন। বালিকা সত্বর অখিলচন্দ্র প্রদত্ত টোপ দুইটা খুলিয়া ফেলিয়া নিজে আবার টোপ পরাইয়া লইল, তাহার পর চারের মধ্যস্থলে বড়শি ফেলিয়া দিল। অখিলচন্দ্র আষাঢ়ের তীব্র রৌদ্র হইতে বালিকাকে রক্ষা করিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মস্তকের উপর ছাতা ধরিলেন। আবার উভয়েই নীরব।

মহা আগ্রহে বালিকা ফাৎনার দিকে চাহিয়া ছিপ ধরিয়া বসিয়াছে। তাহার সেই অপূর্ব্ব বড় বড় চক্ষু দুইটি যেন ফাৎনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য অখিলচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন, তিনি জীবনে কখনও কোন স্ত্রীলোককে মৎস্য ধরিতে দেখেন নাই। এই অপরূপ বালিকার এই অপরূপ মৎস্য ধরিবার ভঙ্গিমায় সত্যই তাঁহাকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের ক্ষুদ্র পল্লীর বন জঙ্গল ডোবার ভিতর এরূপ মেয়ে অশিক্ষিতা হইয়াও শিক্ষিতার ন্যায় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার একেবারে ধারণাই ছিল না। ইহার নাম কি,—ইহার বাড়ী কোথায় এইরূপ নানা প্রশ্ন এই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অখিলচন্দ্রের প্রাণ আকুলি বিকুলী করিতে লাগিল ; কিন্তু বালিকার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাঁহার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। তিনি নীরব থাকিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় নীরব থাকাও অসম্ভব ; তিনি মৃদুস্বরে বলিয়া ফেলিলেন,—"তোমার বাড়ী কি এই কাছেই।"

বালিকা মস্তক না তুলিয়াই বলিল,—"চুপ, কথা ক'ওনা, চারে মাছ এসেছে।"

কাজেই বাধ্য হইয়া অখিলচন্দ্রকে আবার নীরব হইতে হইল ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাঁহার উচ্চ শিক্ষিত মন এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এক অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোট মেয়েটীর দিকে অবনত হইয়া পড়িতে লাগিল। রায় বংশের ভবিষ্যৎ কুলবধূর চিত্রখানি যেন তিনি কল্পনায় এই

বালিকার মুখের উপর প্রতিফলিত দেখিতে পাইলেন। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ কল্পনায় নানা অলঙ্কার পরাইয়া প্রাণের ভিতর একান্ত আদরে লালন পালন করিতে থাকে অখিলচন্দ্রও সেইরূপ নীরবে দাঁড়াইয়া এই ক্ষুদ্র বালিকাকে কল্পনায় শত সাজে সজ্জিত করিয়া পূর্ণ মহীয়সী মূর্ত্তিতে হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় বালিকা সজোরে ছিপে টান মারিল, ঘর ঘর শব্দে হুইল পাঁচ সাত পাক ঘুরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছিপের ডগা অবনত হইয়া পড়িল। অখিলচন্দ্র অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা ছিপে এক প্রকাণ্ড মৎস্য গাঁথিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাজী হারার মাছ লইয়া অখিলচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড জিনিস তাঁহাকে সেই দীঘির পাড়ে রাখিয়া আসিতে হইল। যাহা লইয়া মানুষের দম্ভ—প্রতিপত্তি; যাহা জীবের জীবন, এমন যে প্রাণ সেইটাই যেন তাঁহার চোখের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া দীঘির পাড়ে আছাড় খাইয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল। যেন জগতের সমস্ত আলো—সমস্ত বাতাস তাঁহার অন্তরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বালিকার সহিত চলিয়া গেল।

তিনি যখন বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা হয় নাই, আষাঢ়ের শেষ বেলা। সমস্ত দিন বরুণদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পর জয়পরাজয়ের মীমাংসা না করিয়াই সূর্য্যঠাকুর বিষম বিরক্ত হইয়া পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন। তখনও লতায় পাতায়, প্রাসাদে কুটীরে তাঁহার রক্ত নয়নের প্রতিবিম্ব ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। দিবানিদ্রায় পূর্ণ সুখ উপভোগ করিয়া সবেমাত্র গৌরীশঙ্কর রায় বৈঠক-খানা বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন। তখনও তাম্রকূট সটকার উপর সম্পূর্ণ ভাবে ধরিয়া উঠে নাই, সেই সময় অখিলচন্দ্র গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে আসিয়া ফরাসের উপর ধপাস করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভৃত্য পদ্মলোচনও অখিলচন্দ্রের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সে একটা প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য রায় মহাশয়ের সম্মুখে আনিয়া মেজের উপর ফেলিল। এত বড় একটা প্রকাণ্ড সাত আট সের রোহিত মৎস্য সম্মুখে দেখিয়া বৃদ্ধ রায় মহাশয় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। এত বড় মৎস্যটাকে তাঁহার পৌত্র বড়শিতে শীকার করিয়াছে, ইহাতে যেন তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে একটা আনন্দের তারাবাজী সড় সড় করিয়া বাহির হইয়া মুখে চোখে ফুটিয়া পড়িল। তিনি তাঁহার জীবনের সম্বল, রায়-বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ পৌত্রের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া, আজ যে শীকারটা বড় জবর হয়েছে দেখ্‌ছি।"

কিন্তু পৌত্র সে বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না, কেবল মাত্র একটা প্রকাণ্ড বুকভাঙ্গা নিশ্বাস লইয়া উঠিয়া বসিলেন। একবার মাত্র ঠাকুরদাদার দিকে একটু ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া আবার মস্তক অবনত করিলেন। বৃদ্ধের পরিপক্ক দৃষ্টি নাতির ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। এত বড় মৎস্য শীকার করিয়া আজ তাঁহার পৌত্রের এ কি ভাব! মৎস্য ধরিবার সে উৎসাহ, সে আনন্দ, সে অস্থিরতা কোথায় তিরোহিত হইল! পৌত্রের জন্য বৃদ্ধের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। নিশ্চয়ই নাতির শরীর অসুস্থ। গৌরীশঙ্কর রায়ের মুখের হাসি মুহূর্ত্তে বিলীন হইল। রায় মহাশয় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়ার কি শরীরটা আজ একটু অসুস্থ?"

যেন উত্তর না দিলে নয়, অখিলচন্দ্র সেই ভাবে বলিলেন, "কই না।"

রায় মহাশয় কহিলেন, "তবে এ ভাব কেন? এত বড় একটা মাছ ধরে আনলে, স্ফুর্ত্তি নেই, আনন্দ নেই, ব্যাপার কি?"

"মাছতো আমি ধরিনি দাদামশাই," একবার ঘাড় তুলিয়া অখিলচন্দ্র এই কয়টী কথা বলিয়া আবার মস্তক অবনত করিলেন। বৃদ্ধ রায় মহাশয় পৌত্রের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ক্রমেই বেশ একটু অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মাছটা ধর্‌লে কে হে?"

আবার একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া অখিলচন্দ্র রীতিমত গম্ভীর গলায় বলিলেন, "একটী মেয়ে।"

"মেয়ে"! গৌরীশঙ্কর রায় প্রখর দৃষ্টিতে একবার তাঁহার নাতির দিকে চাহিলেন। তাহার পর সট্‌কার নলটা টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাই বল! আমি ভেবেই অস্থির হচ্ছিলেম। বুড়ো হয়েছি, একটু ভেঙ্গেচুরে না বল্‌লে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না। তা মেয়েটার বয়স কত হে? বিয়ে হয়নি নিশ্চয়ই। দেখ্‌তে শুন্‌তে যে মন্দ নয়, সে কথা জিজ্ঞাসা করাই বিড়ম্বনা। তবে সে শুধু মাছ গেঁথেই ক্ষান্ত হয়নি, তোমাকেও রীতিমত গেঁথেছে। তোমারই ছিপ, তোমারই বড়শি আর মাঝখান থেকে ভায়া পড়্‌লে কি না—তুমিই গাঁথা।"

অখিলচন্দ্র একেবারে দাদামহাশয়ের কোলের নিকট আসিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "দাদা মশাই, যদি বিয়ে কর্ত্তে হয় তো এই মেয়ে। যদি দেখ্‌তে, আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি, তোমারই বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হ'তো। একখানা সাদা দিশী

কালা পেড়ে সাড়ী পরা, হাতকাটা জ্যাকেটের লেসে হাতের অর্দ্ধেক খানি ঢাকা। গলায় এক ছড়া সরু হার, কাপড়ের বাহিরে আধখানা চিক্‌চিক্ করছে, হাতে সরু সরু টুক্‌টুকে গিনি সোনার ক'গাছি চুড়ি। আমি যখন তার মাথায় ছাতা ধরে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেম, তখন সত্যি বল্‌ছি দাদামশাই, আমার মনে হচ্ছিলো যেন কোন স্বর্গের দেবকন্যার মাথায় ছাতা ধরে আছি। দাদামশাই, যদি এ মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে না পারি, তবে আমার জীবনই বৃথা।"

রায় মহাশয় তাকিয়া ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া বসিয়াছিলেন, বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা ভায়া! তা ভায়া তুমি কেন শান্তনুর মত দাসরাজার কাছে গিয়ে কন্যাটী ভিক্ষা করলে না। আমি ভাব্‌তুম, ভায়া আমার, এত অল্প বয়সে এত গুলো পাস কল্লে কি ক'রে! আজ বিশ্বাস হ'লো,—না তুমি পার,—তোমার ক্ষমতা আছে। তবে কথা হচ্ছে কি জান ভায়া, বার ইঞ্চি ছাতিতে ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতির জামা হ'লে সে যেমনই দেখতে হ'ক্ পরা চলে, কিন্তু যদি ছয় ইঞ্চি ছাতি হয় তা হ'লে যে মোটে পরাই চলে না।"

ঠাকুরদাদার কথার ভাব আজ অখিলচন্দ্র ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। আর হৃদয়ঙ্গম হইবেই বা কি করিয়া,— যাহার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই প্রাণটাই যখন নাই, তখন হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। তিনি কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি যে ঠাট্টা কর দাদামশাই, তার তো কোন অর্থ ই হয় না।"

রায় মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া, অর্থ বেশ পরিষ্কার

পড়ে রয়েছে। কথা হচ্ছে এই মেয়েটী যেমনই হক্, জাত বিচার মানতে হবে তো। আমরা যখন খিষ্টেন নই, তখন তো আর একটা অজাতের মেয়ে ঘরে আনতে পারি না। যে মেয়ের হাতে এত বড় একটা মাছ বড়শিতে উঠে, তার পাকা হাত;—সে কি আর মেছুনীর মেয়ে না হয়ে যায়।"

ঠাকুরদাদার কথায় অখিলচন্দ্র বিরক্ত ভাবে গলাটা একটু চড়া পর্দ্দায় তুলিয়া বলিলেন, "দাদামশাই, তুমি তাকে দেখনি, তাই এ কথা বলছ। যদি একবার সে মুখখানি দেখতে তা হ'লে নাগোর-দোলায় চড়ার মত তোমার মাথা বনবন্ করে ঘুরে যেত। দাদা-মশাই তারা আকাশে বড় জোর একটু চিক্‌মিক্ কর্ত্তে পারে, তা থেকে কখনই জ্যোৎস্না বেরুবে না। আমি তোমায় নিশ্চয় বলে দিচ্ছি,—সে কোন বড় ঘরের মেয়ে না হয়ে যায় না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, তা যদি হয় তাহলে তো উত্তম কথা। সে যদি আমাদের পাল্টা ঘর হয়, তাহ'লে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্। সে যারই মেয়ে হক্, আমি তাকেই সেই মহা আকাঙ্খার সামগ্রী রায়-বংশের পবিত্র কুলবধূর আসন, যা একদিন তোমার মার, তোমার ঠাকুরমার ছিল, আমি নিজে কোলে করে এনে তাকে সেই আসনে বসিয়ে দেব। ভায়া, বল আমি কবে তোমার কোন সাধটা অসম্পূর্ণ রেখেছি। আর এটাও স্থির জেন, গৌরীশঙ্কর রায় ইচ্ছা কল্লে, এ তল্লাটের এমন কেউ নেই যে মুখ তুলে বলে তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে না। সে কথা যাক্, এখন মেয়েটীর নাম কি শুনি?"

অখিলচন্দ্র মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "দাদা মশাই মোটেই অবসর পেলুম না। তার নাম ধাম জানবার কিন্তু আমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেম। কি করবো বিশেষ কিছুই সুবিধা কর্ত্তে পারলুম না।"

রায় মহাশয় এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "খুব ভাল! সমস্ত দিন তার সঙ্গে এক যায়গায় থেকে তার নামটাও জেনে আসতে পারনি।"

সন্ধ্যা উৎত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ভৃত্য কক্ষে আলো দিয়া গেল। রায় মহাশয় আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন সেই সময় রসিক মোহন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার নগ্ন গাত্রে কেবল মাত্র একখানা চাদর। বাম হস্তে একটা ভাঙ্গা টিনের লণ্ঠন, দক্ষিণ হস্তে একটা মোটা বাঁশের লাঠি। রসিক সম্মুখে প্রকাণ্ড মাছ দেখিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল, এক গাল হাসিয়া বলিল, "দেখুন ছোট-বাবু আমার কথা ফল্‌লো কি না। এত পুকুর তো ঘুরছিলেন এমনটি কোথাও হয়েছিল! একি মাছ, যেন একটা কুমীর। বড়কর্ত্তা, মাছটা কোটবার হুকুম হয়ে যাক্। বড় বড় খানকতক দাগা নিয়ে যেতে হবে।"

রায় মহাশয় ভৃত্যকে মাছটা কুটিবার জন্য বাটীর ভিতর লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। রসিক ফরাসের একধারে বসিতে বসিতে অখিলচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ছোটবাবুর মুখখানা ভার ভার ঠেক্‌ছে কেন?"

অখিলের হইয়া রায় মহাশয় উত্তর দিলেন, "ওই মাছটাই

তোমার ছোটবাবুর গেরো ঘটিয়েছে। একটি মেয়ে ঐ মাছটি তোমার ছোটবাবুকে ধরে দিয়েছে। সঙ্গে কিছু না থাকায় মাছ ধরার পারিতোষিক হিসেবে ভায়া তাকে প্রাণটা দিয়ে নির্জীব হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। কিন্তু প্রাণ যে কাকে দিলেন, তার নাম জানেন না, ধাম জানেন না, জানেন কেবল গলায় এক ছড়া সরু হার, আর হাতে টুক্‌টুকে সোনার চুড়ি।"

রায় মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া রসিক বলিয়া উঠিল, "আর বল্‌তে হবে না,—ছোটবাবু নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল বারটার মধ্যে এইখানে বসে সব খবর আগা গোড়া ঠিক ঠাক্ মিলিয়ে নেবেন। আপনাদের আশ্রিত রসিকমোহন বেঁচে থাক্‌তে কোন চিন্তা নেই। সোনার সরু হার, টুক্‌টুকে চুড়ি,—আর যায় কোথায়!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সম্মুখে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়া তারিণীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে খুড়ী, কমল কোথায় গা?"

খুড়ী বোসেদের বিস্তৃত বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া বৃন্দাবন হইতে আনীত তাঁহার ফরমাসী তুলসীর মালটা ফিরাইতেছিলেন। তখন বোধ হয় একশত আটবার মালাটা পাক খায় নাই, কথা কহিলে পাছে খেই হারাইয়া যায় সেই আশঙ্কায় তিনি ইঙ্গিতে উপরের শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। তারিণীচরণ খুড়ীকে আর কোন কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

রতন বোসের বিধবা পত্নী কমলরাণী শয়ন কক্ষে বসিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। বিস্তৃত শান্ত নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত আকাশের মধ্যে যেন তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি বিগলিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বয়স এখনও ত্রিশের উর্দ্ধে যায় নাই। অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য এখনও তাঁহার পরিপূর্ণ নিটোল দেহটীকে বর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। ত্যাগের প্রজ্জ্বলিত অনলে দগ্ধ হইয়া তাহা যেন আরও অপরূপ, আরও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। একখানি মোটা শুভ্র থান পরিহিত, গাম্ভীর্য্যের পূর্ণ

মূর্ত্তি গৃহের মধ্যস্থলে থাকিয়া সমস্ত কক্ষটী গম্ভীর করিয়া রাখিয়াছিল। তারিণীচরণ উপরে উঠিয়া বরাবর একেবারে কমলরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়াই কহিল, "তা হ'লে কমল কি করবে স্থির করলে ?"

কমলরাণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, দ্বারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কিসের বড়দা ?"

তারিণীচরণ কমলরাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রতন বোসের মৃত্যুর পর সে তাহার ক্ষুদ্র সংসারটী তুলিয়া আনিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর চার মহল বাটীর এক মহল মৌরসী ভাবে দখল করিয়া বসিয়াছে এবং ভগিনীর কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য রতন বোসের সমস্ত জমিদারীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসিবার সময় বিধবা খুড়ীকেই বা কাহার কাছে রাখিয়া আইসে, কাজেই তাঁহাকেও সঙ্গে আনিতে বাধ্য হইয়াছে। তারিণীচরণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "এই পুষ্পির বিয়ের কথা বোন। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আজ ক'দিন থেকে বসে আছে, তোমার একটা উত্তর না নিয়ে তো আর যেতে পারে না। আমার তো বোন খুব পছন্দ, ছেলেটী দেখতে শুনতে ভালো, লেখা পড়াও বিদ্যা শিখেছে। এখন কেবল তোমার মতের অপেক্ষা।"

কমলরাণী নীরবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দাদা, ছেলে যেমনই হক্, ঘর বাড়ী নেই,—বাপ মা নেই,—এমন ছেলের হাতে আমার পুষ্পকে দিতে কেমন মন সরে না।

তাঁর বড় আদরের পুষ্প। তিনি বরাবর বল্‌তেন,—যে আমি এমন ঘরে পুষ্পের বিয়ে দেব, যারা আমার চেয়েও বড়লোক,—যাদের ছেলে আমার মেয়ের চেয়েও আদরের। যাদের বউকে সাজিয়ে আস মিটবে না, যাদের বউ হবে সকলের প্রাণ। তিনি বল্‌তেন, আমি এমন সাজিয়ে পুষ্পকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাব যে তারা অবাক হ'য়ে যাবে। এমন তত্ত্ব করবো যা কেহ কখনও দেখেনি।"

পতির স্মৃতি ভাসিয়া উঠায় পত্নীর হৃদয়ের সমস্ত তার করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। ফল্গুনদীর মত অশ্রু-সমুদ্র চক্ষের নিম্নে তোলপাড় করিতে লাগিল। কমলরাণী নীরব হইলেন। তারিণীচরণ বলিল, "তা তুমি যাই বল বোন আমরা কিন্তু প্রাণধরে পুষ্পিকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পারবো না। এ ছেলে পছন্দ না হয়, ছেলের অভাব কি। কিন্তু আমার ইচ্ছে একটি বেশ ভালো ছেলে দেখে ঘর জামাই করে রাখি। পুষ্পিকে যে বিয়ে কর্‌বে তারতো আর টাকার অপ্রতুল হবে না। পুষ্পির যা আছে তাই খায় কে! তার শ্বশুরঘর করবার দরকার কি! আর সে কোন্ দুঃখেই বা শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

ভ্রাতার কথায় ভগিনীর প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ অশ্রুজল প্লাবিত সুগভীর মৌনতার মধ্যে হৃদয় মন নিমগ্ন করিয়া কমলরাণী অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "মেয়ে মানুষ শ্বশুর-বাড়ী যাবে কোন্ দুঃখে! দাদা যে মেয়ে মানুষের শ্বশুরবাড়ী নেই, তার মত ভাগ্যহীনা পৃথিবীতে আর কে আছে? মেয়ে

মানুষের গর্ব্বের বল,—অহঙ্কারের বল যা কিছু তা সবই তো তার সেই শ্বশুরবাড়ী। বাপের রাজভোগের চেয়ে স্বামীর শাক-ভাত যে নারায়ণের প্রসাদের চেয়েও পবিত্র। ঘর জামায়ের হাতে আমি পুষ্পকে কিছুতেই দেব না। তুমি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে বল, তিনি এমন একটী পাত্রের সন্ধান করুন, যার মা বাপ আছে, ঘর-বাড়ী আছে,—যাকে জামাই বল্‌তে প্রাণে আনন্দ হয়।”

তারিণীচরণের বরাবরই ইচ্ছা পুষ্পের সহিত কোন গরীবের সন্তানের বিবাহ হয়। তাহা হইলে তাহাকে আর এই মৌরসী আসন হইতে নড়িতে হয় না। গরীবের সন্তান সে জমি-দারীর কিছুই বুঝিবে না, তাহাকে নাম মাত্র খাড়া রাখিয়া সে নিজেই জমিদার হইয়া বসিতে পারে। জমিদারীর সংক্রান্তে আসিয়া জমিদার যে কি চিজ্ তাহা জানিতে তারিণীচরণের বাকী নাই। যদি কোন জমিদারের পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ হয় তাহা হইলে তাহার সমূহ বিপদ। কমলরাণী যে কয়দিন,— তাহার পর তাহাকে একেবারে পথে বসিতে হইবে। কাজেই তাহার ভগিনীর এই গোলমেলে কথাগুলা তাহার কর্ণে একে-বারেই বেসুরা বাজিয়া উঠিল, সে যেন একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, —“তা তুমি যেমন ইচ্ছে করবে তেমনিই হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই, যদি কোন বড় লোক বা জমিদারের ছেলের সঙ্গে পুষ্পির বিয়ে হয় তা হ’লে তোমার এই এত সাধের স্বামীর বাড়ী,—শ্বশুরের ভীটে দু’দিনে বাদুড় চাম্‌চিকের বাসা হবে। তারাতো আর তোমার মেয়েকে এখানে ফেলে রাখবে না।”

কমলরাণী ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা! আমার নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য আমি কখনই আমার মেয়ের ক্ষতি করবো না। তিনি বেঁচে থাক্‌লেও কখনও তা করতেন না। যখন ভগবান আমার ছেলে দেননি তখন নিশ্চয় তারও তাই ইচ্ছে। তুমি যদি কোন গরীবের ছেলে এনে ঘর-জামাই করে রাখ, তাতেই কি আমার শ্বশুর-কুলের নাম বজায় থাক্‌বে। না দাদা, আমি প্রাণধরে পুষ্পকে ঘর-জামায়ের হাতে দিতে পারব না।"

তারিণীচরণ মুখখানা কালি করিয়া বলিল,—"তা তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে তাই হবে। তা হ'লে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে সেই কথাই বলে দিই, যে ও ছেলে তোমার পছন্দ নয়—"

তারিণীচরণের আরও বোধ হয় কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বলা হইল না,—খুড়ী একেবারে হন্তদন্ত হইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পুষ্প, ফুটন্ত পুষ্পের ন্যায় সুরভী ছড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া একেবারে তাহার জননীর কোলের নিকট যাইয়া বসিয়া পড়িল। মায়ের কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। খুড়ী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে উত্তপ্ত খইয়ের মত ছিটকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মা তোমার মেয়ের হাসি একটু বন্ধ করাও। সময় নেই,—অসময় নেই কেবল হাসি। এমন পোড়া হাসিও ত মা কখন দেখিনি। আমি গেলুম কোথায় ভাল কথা বলতে, তা না মেয়ে একেবারে হেসে ঢলে পড়ছেন।"

ব্যাপার কি জানিবার জন্য কমলরাণী খুড়ীর মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিলেন কিন্তু খুড়ী সে দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, তিনি একটু দম লইয়া তারিণীচরণের দিকে ফিরিয়া আবার আরম্ভ করিলেন,—"বলি তারিণী, তোরা কি দিন রাত ঘুমস্। এত বড় মেয়ে হ'লো, আজও একটা বর জোটাতে পারলিনি।"

তারপর আবার কমলরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আর তোমায় বলি বাছা, তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলে। আমরাও মেয়ে ছিলুম,—আমাদেরও মা ছিল, কিন্তু বাছা এমন বেহায়াপানা সাত পুরুষে কখন দেখিনি।"

এক নিশ্বাসে সমস্ত কথাটা বলিতে না পারায় খুড়ীর যেন তৃপ্তি হইল না। তিনি আবার ভনিতা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তারিণীচরণ তিরস্কার স্বরে বলিল, "বলি হয়েছে কি, চেঁচিয়ে ত বাড়ী মাথায় করে তুলেছ। তোমার সব কথায় মাথা ব্যথা হয় কেন বল্‌তে পার ?"

তারিণীচরণের তিরস্কার খুড়ীকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া দিল। তিনি মনে মনে বিড় বিড় করিতে করিতে বাহির হইয়া যাইতে-ছিলেন,—কমলরাণী ডাকিলেন ; অতি কোমলস্বরে বলিলেন, "কি হয়েছে খুড়ীমা, পুষ্প বুঝি আবার তোমার সঙ্গে লেগেছে ?"

খুড়ী মুখখানা ভারি করিয়া বলিলেন,—"দরকার কি বাছা আমার বড়লোকের কথায় থেকে। তোমার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা কর না, এখনি সব শুনতে পাবে। উনি আজ কার সঙ্গে

কোথায় মাছ ধর্‌তে গেছিলেন, তার কাছে থেকে আবার আংটী আনা হয়েছে।"

পুষ্প জননীর কোল হইতে মস্তক তুলিয়া ফনির্ণীর ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিল, "কার সঙ্গে কোথায় গেছিলুম বই কি। আমি ত রাণীগড়ে মাছ ধর্‌ছিলেম।"

কমলরাণী বিশেষ বিস্মিত হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাণীগড়ে মাছ ধরছিলি! কার সঙ্গে মাছ ধর্‌তে গেছিলি?"

পুষ্প গম্ভীর ভাবে বলিল, "কার সঙ্গে যাব আবার! একটী বাবু মাছ ধরছিল, সে মোটেই মা মাছ ধরতে জানে না, তাই তাকে একটা মাছ ধরে দিলুম,—এই দেখনা কেমন আংটী।"

পুষ্প তাহার জননীর সম্মুখে তাহার সুন্দর হাতখানি বাহির করিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইল। অঙ্গুরীর উপরিস্থিত বহুমূল্য প্রস্তরখানা গৃহের উজ্জ্বল আলোকে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। কমলরাণী বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে কন্যার হস্তের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা রাণী-গড়ে কে মাছ ধরছে?"

তারিণীচরণ এতক্ষণ নীরবে অঙ্গুরীর প্রস্তরখানার দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া নিজেই যেন খাটো হইয়া পড়িতেছিল। ভগিনীর কথায় গর্জ্জিয়া উঠিল, "এত আস্পর্দ্ধা আবার কার,—রায় মশায়ের নাতি! আজ তিন চার দিন হ'লো রাণীগড়ে মাছ ধরবার জন্য পাস করিয়েছে। নবাবী দেখিয়া

আবার আংটী দিয়ে যাওয়া হয়েছে। একেবারে নবাবী ভেঙ্গে দিচ্ছি,—আমি এখনি এর একটা হেস্তনেস্ত করছি।"

পুষ্প বলিল, "তা বইকি, নবাবী দেখিয়েছে না আর কিছু, আমি বাজীতে জিতেছি।"

কমলরাণী অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ছিঃ মা, পরের আংটী নিতে আছে।"

তাহার পর তারিণীচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দাদা এখনি একজন লোক দিয়ে আংটীটা পাঠিয়ে দাও,—আর রায় মশাইকে লিখে দাও যে তাঁর নাতির এ কাজটা একেবারেই বুদ্ধিমানের মত হয়নি।"

পুষ্প গম্ভীর ভাবে বলিল,—"হাঁ আমি আংটী দিলুম আর কি! —বাজীতে জিতেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নায়েব মহাশয় পত্রখানা পাড়িয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরীশঙ্কর রায়ের ক্রোধের বহ্নি মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। জমিদারী করিয়া তাঁহার মাথার প্রত্যেক চুল গাছটী শাদা হইয়া গিয়াছে,—তাঁহাকে ভদ্রতা শিক্ষা করিতে হইবে তারিণী দের কাছে! যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বয়ং রতন বোস পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, আর আজ কি না তাহারই আশ্রিত—তাহারই অন্নভোজী শ্যালক তারিণী দে তাঁহাকে এরূপ অপমান জনক পত্র লিখিয়াছে! রতন বোস জীবিত থাকিলে সেও এরূপভাবে পত্র লিখিতে রায় মহাশয়কে সাহস করিত কি না সন্দেহ। ক্রোধে বিস্ময়ে গৌরীশঙ্কর একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষের তারা দুইটা উল্কার মত অগ্নি গোলক হইয়া চারিদিক দগ্ধ করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। কাছারির কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া কর্ম্মচারিগণ যে যাহার খাতার সম্মুখে কর্ণে কলম গুজিয়া ভীত ভাবে রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা সকলেই পুরাতন কর্ম্মচারী; তাহারা রায় মহাশয়ের এ ভাব ইতিপূর্ব্বে আর কখনও লক্ষ্য করে নাই। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রায় মহাশয় উত্তেজিত

কণ্ঠে অখিলচন্দ্রকে সংবাদ দিতে একজন লোককে আদেশ করিলেন ও নায়েব মহাশয়কে পত্রখানা পুনরায় আর একবার পাঠ করিতে বলিলেন! একজন পেয়াদা অখিলচন্দ্রকে সংবাদ দিতে ছুটিল। নায়েব রায়গোবিন্দ দাস সুমসৃণ ভুড়িটীর উপর সদ্য-ধৌত চাদরখানা ফেলিয়া তাহার প্রিয় লাঠী গাছটি লইয়া অর্দ্ধ-বঙ্কিম ভাবে রায় মহাশয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, কর্ত্তার আদেশ পাইয়া সে পত্রখানা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়

মান্যবরেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং -

পরে আপনাকে অবগত করান যাইতেছে যে কল্য আপনার পৌত্র আমাদের রাণীগড়ে মাছ ধরিতে আসিয়া যে কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা লৌকিকতা ও ভদ্রতা উভয় হিসাবেই একেবারে সীমার বাহিরে গিয়াছে। আপনার পৌত্রের বিশেষ সৌভাগ্য যে সে ঘটনাটা আমরা তাহার উপস্থিতি সময়ে জানিতে পারি নাই, নচেৎ আমরা তাহাকে শিখাইয়া দিতাম ভদ্রতা কাহাকে বলে। আপনার শ্রীমান মৎস্য ধরিবার অছিলায় আসিয়া একটা অঙ্গুরীয় প্রদানে কমলরাণীর কন্যার বিশেষরূপেই সম্মান হানি করিয়াছেন,—সেই জন্য আপনাকে জানান• যাইতেছে যদি আপনি ও আপনার পৌত্র এই ত্রুটীর জন্য কমলরাণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তবে তাহার প্রতিকারের ভার আমাদের নিজের হস্তেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে আর

অধিক কি লিখিব, ভদ্রলোকের অবিবাহিত কন্যার হস্তে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দেওয়া যে কতদূর অন্যায় তাহা আপনার আদরের পৌত্রকে একটু বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়া দিবেন। আর যদি আপনি বার্দ্ধক্যবশতঃ অক্ষম হন, তবে তাহাকে আমাদের কাছারী বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন, আমরা তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিয়া দিব যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি জীবনে আর কখনও এমন কার্য্য না করেন। আপনার পৌত্রের অঙ্গুরীয়ের মূল্য কত পত্র পাঠ জানাইবেন, আমরা তাহার মূল্য পাঠাইয়া দিব। ইতি—তারিখ।

নিবেদক

শ্রীতারিণীচরণ দে।

কাছারী বাটীর বারান্দার এক পার্শ্বে বাটীর সর্দ্দার কালু বসিয়াছিল, পত্র পাঠ শেষ হইবামাত্র সে তাহার বাবরী চুলটা একবার নাচাইয়া মাস্থুড় বাঁশের পাকা লাঠিটা বার দুই মাটীর উপর ঠুকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কর্ত্তা হুকুম করুন,—শালার মাথাটা ছিঁড়ে এখানে নিয়ে আসি।"

কালুর পার্শ্বে অপর একজন সর্দ্দার দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "গৌরীশঙ্কর রায়ের নামে কত লাঠি উঠতে পারে, কর্ত্তা হুকুম কর, একবার দেখাই।"

গৌরীশঙ্কর রায়ের সাত পুরুষের প্রজা ভীষণাকৃতি পালোয়ান মুসলমান কাদের খাঁ তাহার খাজনার বাকি হিসাব মিটাইতে আসিয়াছিল। সে তাহার প্রকাণ্ড ছাতিটা ফুলাইয়া রায়মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল,—তাহার ভাঙ্গা গলা

যেন কাঁশরের ন্যায় বাজিয়া উঠিল, "গৌরীশঙ্কর রায়ের নামে এখনি কি হাজার লেটেল খাড়া হবে না! কর্ত্তা হুকুম—শুধু হুকুম দাও, শালাকে একেবারে লাল ঘোড়ায় চড়িয়ে দিই!"

কিন্তু রায় মহাশয় নীরব; তিনি ভাবিতেছিলেন এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তিনি যে তাঁহার পৌত্রকে বড় আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সে যেই হউক, সে যদি তাঁহাদের পাল্টা ঘর হয়, তবে তিনি যে তাহাকেই রায়বংশের কুলবধূ করিবেন। তখন তো তাঁহার এ কথা একবারও মনে হয় নাই যে সে কন্যা আর কেহ নয়, তাঁহারই প্রতিবেশী জমিদার রতন বোসের একমাত্র কন্যা পুষ্পরাণী। যদি অখিলচন্দ্রের বর্ণনাটা একটু চিন্তা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে হয়তো তাহা বুঝিলেও বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে প্রথম হইতেই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, সে আর কেহ নয়, নিশ্চয়ই কোন একটা বুনোদের মেয়ে। সেই সময় রসিকমোহন কাছারী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সে বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াছিল,—তাই সে একবার রায় মহাশয়, একবার নায়েব মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু যেন বিস্মিত হইয়া বলিল,—"ব্যাপারখানা কি,—বড় কর্ত্তার মেজাজটা আজ একটু রুক্ষ রুক্ষ ঠেক্‌ছে কেন?"

এতক্ষণে রায় মহাশয় কথা কহিলেন। তিনি রসিকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তারপর তোমার খবর কি? ছোটবাবুকে যে সংবাদ দেবে বলেছিলে, তার কোন সংবাদ পেলে?"

রায় মহাশয়ের কথায় রসিক এক গাল হাসিয়া উত্তর দিল।

"বড়কর্ত্তা, রসিক যখন বলে গেছে, তখন সে সংবাদ না নিয়ে ফেরবার লোক নয়। তবে কথাটা কি হয়েছে জানেন,—সংবাদটা বড় বেগোছ বলে ঠেক্‌ছে।"

রায় মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি রকম?"

রসিক রায় মহাশয়ের কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া একটু চাপা গলায় বলিল,—"সম্বন্ধি তারিণী দে ব্যাটা যে সহজে রাজী হবে, তা ব'লে বোধ হয় না।"

রসিকের কথায় রায় মহাশয় বুঝিলেন রসিক সন্ধান করিতে ছাড়ে নাই। তিনি কোন কথা কহিলেন না, কেবল ইঙ্গিতে নায়েবকে সেই পত্রখানা রসিকমোহনকে দিতে বলিলেন। পত্রখানা পাঠ করিতে করিতে রসিকের মুখভঙ্গি নানারূপ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। সে কোনক্রমে পত্রখানা পাঠ শেষ করিয়া একবার রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর পত্রখানা ফরাশের উপর ফেলিয়া দিয়া, সে তাহার চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া বাঁশের লাঠিটার উল্টা দিক ধরিয়া দুই তিনবার রায় মহাশয়ের মুখের সম্মুখে ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "গৌরীশঙ্কর রায়ের প্রজারা কি সব মরেছে! তারা কি লাঠি চালাতে জানে না!"

অমনি কাছারী বাটীর চতুর্দ্দিক হইতে একটা বিকট 'রে রে' শব্দ উঠিল। ভট্টাচার্য্য খুড়া বাটীর বিগ্রহ গোপীনাথের পূজা শেষ করিয়া ফিরিতেছিলেন,—এই 'রে রে' শব্দে তাঁহার অন্তরাত্মা যেন একেবারে অন্তরের মধ্যে বসিয়া যাইবার মত হইল,—তিনি

তাড়াতাড়ি কাছারী বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া রায় মহাশয়ের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন,—মনে মনে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ব্যাটারা একেবারে ডাকাত।"

ঠাকুরদাদার তলব পাইয়া অখিলচন্দ্র কাছারী বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাছারী বাটীতে উপস্থিত সমস্ত প্রজামণ্ডলী আবার সেই বিকট 'রে রে' শব্দ করিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য খুড়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ-তালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যক্ষভাবেই তাঁহার দেহ থরহরি কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার হস্তস্থিত সামান্য নৈবিদ্যের পুটুলিটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিলেন। অখিলচন্দ্র ব্যাপার কি ভাল বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে ঠাকুর-দাদার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রসিক অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ছোট বাবু, কোন ভয় নেই, সুভদ্রা হরণ হবে।"

কিন্তু রায় মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নেই। প্রথমে জানা দরকার এ পত্র কমলরাণীর অনু-মত্যানুসারে লিখিত হয়েছে, না তারিণীচরণের খেয়াল। কাল সন্ধ্যার পর রসিক তুমি এর একটা পাকা খবর নেবে। তারপর যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করলেই হবে।"

কাছারী বাটীর প্রত্যেক প্রাণী একটা উদ্‌গ্রীব আগ্রহে রায় মহাশয়ের শেষ আদেশটা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু রায় মহাশয়ের কথায় সকলেই যেন বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণবর্ণ কয়লা অগ্নির উত্তাপে রক্তবর্ণ হইয়াছিল, সহসা যেন খানিকটা জল পড়িয়া একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সকলেই ম্লানমুখে নিজ নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। অখিল-চন্দ্র কাছারী বাটীতে প্রবেশ করিয়া 'বিবাদ বিসম্বাদ' প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিয়া একেবারে হক্‌চকিয়া গিয়াছিলেন, তিনি এ যাবৎ কথা বলিবার মোটেই ফুরসুৎ পান নাই, এতক্ষণে একটু অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামশাই সকালে এত বড় বড় কথা ব্যবহার হচ্ছে কেন, এরতো কোন অর্থই খুঁজে পাইনে।"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিল, "ছোট বাবু, বড়কর্ত্তা যে নুয়ে গেল, নইলে—বুঝলেন, এই লাঠিতেই দেখতেন এখনি অর্থ বেশ পরিষ্কার হয়ে আসত।"

রায় মহাশয়ের রাগ অনেকটা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া! মাপ আর বায়না ঠিক জায়গায়ই দিয়েছিলে বটে, কিন্তু কারিকর বড় বেয়াড়া, সে এখন বায়না ফেরত দিতে চায়।"

অখিলচন্দ্র কথাটা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তিনি কথাটার বিষদ ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিলেন। রায় মহাশয় কথাটা ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু ভট্টাচার্য্য খুড়া এতক্ষণে একটু সাহস পাইয়া বলিলেন, "রায়মশাই, একটা স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন। মঘা নক্ষত্রে ফাল্গুনী নক্ষত্রের সংযোগ হলেই প্রায় এইরূপ ঘটে থাকে।"

মঘা নক্ষত্রে ফাল্গুনী নক্ষত্রের সংযোগে কি ঘটে, আর কি

ঘটে না। তাহার মীমাংসা করিবার তখন আর সময় ছিল না, কারণ ভৃত্য পদ্মলোচন আসিয়া সংবাদ দিল বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই তখনকার মত অনেক কথাই চাপা পড়িয়া রহিল। আষাঢ়ের এই অম্লান দিন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আপন আনন্দ ভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বারটী অখিলচন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে বন্ধ করিয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আগুনের সহিত হাওয়া না মিশিলে আগুন যেমন জমিয়া উঠিতে পারে না, আঘাতের পর প্রতিঘাত না হইলে প্রেমও সেই-রূপ আপন রাস্তা খুঁজিয়া পায় না। সেই দীঘির পাড়ে ফুলসাজে সজ্জিত চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা অখিলচন্দ্রের হৃদয়ে যে খোঁচাটা মারিয়াছিলেন, তাহাতে হৃদয়ের অনেকটা স্থান জুড়িয়া ক্ষত হইলেও তাহাতে একটা আশার প্রলেপ খাইয়া কতকটা আশু প্রতিকার হইয়াছিল ; কিন্তু আজ কাছারী বাড়ীতে সেই আঘাতের উপর আবার প্রতিঘাত হওয়ায় ক্ষতটা একেবারে রক্তারক্তি হইয়া সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া কাঁচা ঘায়ে পরিণত হইল। জমাটী আসরে প্রসিদ্ধ গায়কের মুখে যদি সহসা মধ্যপথে গান বেসুরা বাহির হইয়া আইসে, তাহা হইলে যেমন সমস্ত যন্ত্র একেবারে তারস্বরে কাঁদিয়া উঠে, আজও সেইরূপ অখিলচন্দ্রের আশার গান সহসা বেসুরা বাজায় তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত তার থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

মৎস্য ধরিতে যাওয়া হইবে না, কর্ম্মশূন্য আষাঢ়ের দীর্ঘ মধ্যাহ্ন সুযোগ বুঝিয়া আজ যেন তাঁহাকে চারিদিক হইতে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তিনি শুইতে গেলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

তাঁহার মনের ভিতর আশা ও নিরাশার সাদা কালো দুই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটার কল্লোল এক সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার কর্ণে একটা বিকট অস্পষ্ট শব্দের ন্যায় কেবল ঝমঝম করিতে লাগিল।

অখিলচন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া কক্ষের বাতায়ন সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। যাহা নিত্য, যাহা শান্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী, যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, অখিলচন্দ্রের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি রেণু রেণু হইয়া তাহার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। যে শব্দবিহীন, সীমাবিহীন, মহালোকের নেপথ্য হইতে চিরকাল ধরিয়া জন্ম এবং মৃত্যু, কর্ম্ম এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, কোন অশ্রুত সঙ্গীতের অপরূপ তালে বিশ্ব-রঙ্গভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—অখিলচন্দ্র সেই আলো-অন্ধকারের অতীত দেশ হইতে নরনারীর মধুর প্রেমকে এই আষাঢ়ের মধ্যাহ্নে নিখিলের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। বন-জঙ্গল পরিবেষ্টিত ওই প্রকাণ্ড সৌধের মধ্যে তাঁহার জীবনের চির আকাঙ্ক্ষার,—চির সাধনার সামগ্রী মধুর সঙ্গীতে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। বাতায়ন সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া অখিলচন্দ্র জীবনকে ও জগতকে এক অপরিসীম আনন্দময় রহস্যের মাঝখানে ভাসমান দেখিলেন। এ কি আনন্দ! হৃদয়ের ভিতরে আজ এ কি আনন্দ,—হৃদয়ের বাহিরে আজ এ কি আনন্দ!

ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে আবির ছড়াইয়া এই চিন্তার মধ্যেও সমস্ত পৃথিবী লালে লাল করিয়া সূর্য্য দূরে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে

নামিয়া গেল। গোধূলীর মধুর আলো আঁধারের আলিঙ্গনে সমস্ত পৃথিবী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। ডালে ডালে রাজ্যের পাখী ডাকিয়া উঠিল। সমস্ত আকাশ বাতাস পাগল হইয়া যেন অখিলচন্দ্রের হৃদয়টাকে আলুথালু করিয়া দিতে লাগিল। তিনি প্রেমের স্বপনে বিভোর হইয়া বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার অন্তরাত্মা, তাঁহার নশ্বর দেহ ছাড়িয়া নরলোক হইতে দেবলোকে বিচরণ করিতেছিল। সহসা জুঁয়ের গন্ধ মাতালের ন্যায় কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গাইয়া দিল,—তিনি তাড়াতাড়ী একটি সার্ট পরিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটা নামহীন ক্ষুদ্র নদী—কুল কুল রব তুলিয়া রামজীবন-পুরটা বেষ্টন করিয়া আবহমান কাল হইতে বহিয়া আসিতেছিল। নদীতে নৌকা চলিত না,—ঢেউ উঠিত না,—রোগ যন্ত্রণার পর মৃত্যু যেরূপ নির্ব্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ একটা শান্তি এই নদীটাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অখিলচন্দ্র বাটী হইতে বাহির হইয়া বরাবর সেই নদীটার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে ক্ষীণ সলিলা ক্ষুদ্র তরাঙ্গনী জীবিতেশ্বরের সহিত নিজ কায়া মিশাইবার জন্য যুগান্তর ধরিয়া কি আকুল বিরহ সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছে,—যেন পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া,—পাওয়ার আশাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।

অখিলচন্দ্র নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বালুতটের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সান্ধ্য সমীরণ ফাঁকা নদীর তীরে হুহু শব্দে চারিপাশ হইতে আসিয়া তাঁহার সার্টের উপর লুটোপুটি

খাইতেছিল। তিনি একটা বাঁক্ ফিরিবামাত্র একেবারে একটী বালিকার সামনাসামনি হইয়া পড়িলেন। বালিকা তাঁহার পরিচিত,—এই বালিকাই কল্য তাঁহাকে মৎস্য ধরিয়া দিয়া বাজীতে তাঁহার অঙ্গুরীয়টা জিতিয়া লইয়াছে। বালিকার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র অখিলচন্দ্র তাহাকে চিনিলেন। কাল হইতে এই মুখখানি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছিল। প্রেমের প্রথম ফুল এই মুখখানিই যে তাঁহার হৃদয়-কাননে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বালিকাকে দেখিবামাত্র ঘায়ের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মত তাঁহার হৃদয়-ক্ষত যেন একটা তীব্র অভিমানে জ্বলিয়া উঠিল। অবসর বুঝিয়া প্রত্যেক কথা মনের কপাট খুলিয়া আবার তাঁহার কর্ণের নিকট বাজিতে লাগিল!

তিনিতো বালিকাকে ডাকেন নাই, বালিকা স্বইচ্ছায় আসিয়া তাঁহাকে মৎস্য ধরিয়া দিয়াছিল। বাজিতে আংটীটা জিতিয়া আকুল আগ্রহে তাহা অঙ্গুলীতে পরিয়া অতি সরল ভাবেই চলিয়া গিয়াছিল। অথচ বাটীতে যাইয়া সেই কথাই অন্যরূপ ভাবে বলিয়া মামার সাহায্যে তাঁহাদের অপমান করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। সম্পর্কবিহীন স্বকার্য্যে ব্যস্ত লোকের মধ্যে আবাল্য-কাল তাঁহার কলিকাতাতেই কাটিয়াছে। কখন কদাচিৎ আসিয়া স্বগ্রামে দুই চারিদিন থাকিয়া যাইতেন। ঠাকুরদাদার স্নেহে, আদরে, যত্নে ডুবিয়া সে কয়দিন তিনি পল্লীর হিংসা দ্বেষ দলাদলি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার মনে হইত স্বদেশ,—ক্ষেত খামার পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র পল্লী—শান্তিকুঞ্জ; বুঝি

স্বর্গের চেয়েও তৃপ্তিপ্রদ। কিন্তু এবার আসিয়া ধারাবাহিক ভাবে কিছুদিন থাকিয়া, ঠাকুরদাদার অনুরোধে জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখিবার জন্য কাছারীতে বসিয়া, তাঁহার অনেক জিনিষ নূতন ঠেকিতেছে, অনেক কথা নূতন করিয়া ভাবিতে হইয়াছে। ঠাকুরদাদা পার্শ্বে বসাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দিতেছিলেন, আর তাঁহার চক্ষের সম্মুখে হিংসা দ্বেষ দলাদলি পরিপূর্ণ পল্লীর অধঃপতিত চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছিল। স্বার্থে ও বিনা স্বার্থে লোকে এখানে পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিতে সতত ব্যগ্র কেন, তাহার কোন অর্থই অখিলচন্দ্র খুঁজিয়া পাইতেছে না।

তাঁহার মনে হইল, বালিকার এই আচরণটার মধ্যেও বোধ হয় একটা জমিদারীর কোনরূপ চাল আছে। এখানে খুব সুতীক্ষ্ণ ভাবে অতি সাবধানতার সহিত পা না ফেলিলেই পদে পদে অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা। বালিকার ব্যবহারে, অখিলচন্দ্রের বালিকার উপর বেশ একটু রাগ হইয়াছিল, তাই তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহার দিকে না চাহিয়া পাশ কাটাইতেছিলেন কিন্তু বালিকার দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর পড়িবামাত্র সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার নির্ম্মল মধুর হাসি, তাহার সরল সুন্দর মুখখানিতে যেন স্বর্গের মাধুরী ফুটাইয়া তুলিল। নদী সেই হাসিতে তাহার হাসি মিশাইবার বিফল চেষ্টায় আকুল উচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

বালিকা তাহার পরিচারিকার সহিত নদীর তীরে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া সে বাটী ফিরিতেছিল সহসা

এই বাঁকটার মুখে অখিলচন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সে অখিলচন্দ্রকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু অখিলচন্দ্র অন্য দিকে চাহিয়া বালিকাকে ফেলিয়া অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় বালিকার মধুর আহ্বান ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "ওগো মশাই, শুনুন—শুনুন!"

অখিলচন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য পা দুইটার উপর সজোরে মনের ধাক্কা দিলেন কিন্তু ক্রমাগত চাবুক খাইয়াও বদমাইস ঘোড়া যেমন কেবলই পিছু হটিতে আরম্ভ করে তাঁহার পা দুইটাও মনের ধাক্কা খাইয়াও সেইরূপ একটা বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা করিল। তাহারা পিছু না হটিলেও আর এক পদও অগ্রসর হইতে চাহিল না। পা দুইটায় সহসা যেন পক্ষঘাৎ হইল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে ছুটিল, তাহার চঞ্চলতায় অঞ্চল বালুতটে লুটাইয়া পড়িল, সে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে অখিল-চন্দ্রের হস্ত ধরিল। সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "বা! তুমি তো বেশ ভদ্রলোক! আমি ডাকৃছি, আর তুমি সটান চলে যাচ্ছ!"

বালিকা আসিয়া অখিল চন্দ্রের হস্ত ধরিল, অখিলচন্দ্র তো অবাক! তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান গুলাইয়া গেল;—তিনি হাপাইয়া উঠিলেন। বালিকার প্রথম স্পর্শ, তীব্র মদিরার নেশার ন্যায় তাঁহার সমস্ত দেহ অষাড় করিয়া দিল। ষ্টেসনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রির মত সহসা প্রবেশ পথ খোলা দেখিয়া একেবারে এক সঙ্গে কতকগুলা

কথা তাঁহার কণ্ঠ নালিতে ভিড় করিয়া মারামারি বাধাইয়া দিল। সকলেই সকলের অগ্রে বাহির হইবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে দলিত পিষ্ট করিতে লাগিল। শেষ যেন কতকটা গলদঘর্ম্ম হইয়া বেশ একটু তীব্র ভাবে বাহির হইয়া আসিল, "আর কথায় কাজ কি ; তোমাদের যা ভদ্রতা তা বেশ বোঝা গেছে।"

সহসা পুষ্পকে ছুটিতে দেখিয়া পরিচারিকাও ফিরিয়াছিল, সে যখন দেখিল, পুষ্প যাইয়া একজন অপরিচিত যুবকের হস্ত ধরিল, তখন তাহার একেবারে আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল। সে নিকটে আসিয়া বলিল, "বলি দিদিমণি ! রাস্তা ঘাটে কি এমন বেহায়াপানা ভালো ?"

অখিলচন্দ্রের কথাগুলার রুক্ষ আওয়াজে পুষ্প একেই একটু দমিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর পরিচারিকার কথায় সত্যই তাহার ভারি রাগ হইল, সে বিরক্ত ভাবে বলিল, "তোমায় আর সব কথায় সরদারী কর্ত্তে হবে না। আমি তো তোমার ঝি নই—তুমিই আমার ঝি !"

কথাটার সতেজ আওয়াজ দাসীকে একবারে কাবু করিয়া দিল ! সে মুখখানা কালি করিয়া, "যা ইচ্ছে কর বাছা, আমার তাতে কি," বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ধপাস করিয়া সেই বালির উপর বসিয়া পড়িল।

পুষ্প সে দিকে মোটেই লক্ষ্য না করিয়া অখিলচন্দ্রের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয় বলিল, "আংটিটা হেরে গিয়ে বাড়ীতে বুঝি খুব বোকুনি খেয়েছ ! তাই বুঝি রাগ্ হয়েছে ! তা তুমি যদি

আমায় বলতে, তাহ'লে তো আমি তোমার আংটী নিতুম না, তোমাকেও বোকুনি খেতে হতো না। আংটীর জন্যে তোমার যখন এত দুঃখ, এই নাও তোমার আংটী।"

বালিকা অঙ্গুরীয়টা ফেরত দিবার জন্য হস্ত তুলিল! বালিকার অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয় সেই সন্ধ্যার আলোকেও ঝিকমিক্ করিয়া উঠিল। অখিলচন্দ্রের মনে হইল বালিকার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টা প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার মূল্য যেন আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বালিকার কথাগুলা তাঁহার প্রাণের ভিতর ধিক্কার দিয়া উঠিল। অঙ্গুরীর জন্য দুঃখ! যাহার জন্য আনন্দে প্রাণ দিতে পারেন, তাহার মুখে এই কথা! তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আংটীর জন্য বকুনি খাইনি। আংটী আমার, আমি তোমায় দিয়েছি। তার জন্য আবার গালাগালি দেবে কে?"

পুষ্প আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে রাগ করেছ কেন?"

রাগের কথা মনে হওয়ায় তারিণীচরণের চিঠির অক্ষর গুলো অখিলচন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি বালিকার সুন্দর অপরূপ দেহের প্রতি একবার বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিলেন। তাহা কি সুন্দর,—যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া তাহার উপর পড়িয়াছে কিন্তু তাহা এখনও কিশোরের কোল হইতে জাগিয়া উঠে নাই। শৈল-চূড়ার তুষারের উপর ঊষার আলো ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে কিন্তু বরফ এখনও গলিতে পারে নাই। সকল কথা বলিয়া সেই অকলঙ্ক, শুভ্র, নিবিড়, পবিত্র প্রাণটীর

উপর বেদনার আঘাৎ দিতে অখিল চন্দ্রের প্রাণ চাহিল না, তিনি বালিকার কথার উত্তরে কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া যা তা একটা বলিয়া ফেলিলেন, "পর পুরুষের সঙ্গে তোমার মত বয়সের মেয়ের আলাপ করা কি ভালো ?"

পুষ্পের বয়স চোদ্দ হইলেও সেটা স্বভাবের চৌদ্দ, সমাজের নহে। কেহ তাহাকে কখনও আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই. সেও সেটার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। সে মুখখানি বেশ একটু গম্ভীর করিয়া উত্তর দিল, "যদি পর না ভাবি।"

'যদি পর না ভাবি' তবেইতো বিপদ। অখিলচন্দ্র মুস্কিলে পড়িলেন। সমাজ যে পরকে পর না ভাবিলে ছাড়িতে চায় না,—এ কথাটা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না, তিনি মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদু স্বরে বলিলেন, "যদি পর না ভাব,—যদি পর না ভাব—"

পুষ্প মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি পর ভাব ?"

সর্ব্বনাশ! একটা উত্তরের মীমাংসা হইতে না হইতে তাহা অপেক্ষা জটিল আর একটা! অখিলচন্দ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—তিনি একেবারে দমিয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর একটা কথাও বাহির হইল না, তিনি বালিকার মুখের পানে চাহিয়া তাহার সুকোমল হাত দুইখানি আকুল আগ্রহে চাপিয়া ধরিলেন। চোখে চোখে অনেক কথা প্রাণের তারে বাজিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল না,—জানিল না এই নীরব ভাষায় দুইটী

হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা বদল হইয়া "পর আপন" জটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল। তাহার নিবিড় আনন্দ, গভীর শান্তি, পরম আশ্বাস প্রজাপতির আশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহাদের মাথার উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যহই পুষ্প বৈকালে তাহার পরিচারিকার সহিত বেড়াইতে যাইত, আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটী ফিরিয়া আসিত, কিন্তু আজ বহুক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রিও প্রায় দুই দণ্ড, আড়াই দণ্ড হইতে চলিল তথাপি সে এখনও বাটী ফিরিল না। সন্ধ্যার পর হইতেই কমলরাণী কন্যার চিন্তায় গৃহের মেজের উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতরটা দুর্ভাবনার হামানদিস্তার মাঝে পড়িয়া একেবারে ছেঁচিয়া যেন থেতো হইয়া যাইতেছিল। মায়ের প্রাণ, একমাত্র সন্তানের একটু উনিশ বিশ হইলেই ভাবনায় একেবারে আকুল হইয়া উঠে,—নানা কুকথাই কেবল অমঙ্গলের সূচনা করিয়া থাকিয়া থাকিয়া উঁকিঝুঁক মারিতে থাকে। বহু কষ্টে মনকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া কমল-রাণী এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিলেন কিন্তু আর কোন ক্রমেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। একজন দাসীকে দিয়া তারিণীচরণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার পর রতনবোসের বৈঠকখানা জাঁকাইয়া তারিণীচরণ তাহার কয়েকজন পার্শ্বচর লইয়া, গর্ব্বে স্ফীত হইয়া গলাটা বেশ একটু উচ্চে তুলিয়া 'গৌরীশঙ্কর রায়কে আজ কিরূপ অপমান-

জনক পত্র লিখিয়াছে' তাহারই সমালোচনায় মাতিয়া গিয়াছিল। সেই সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "কর্ত্তৃঠাকুরাণী তাঁহাকে ডাকিতেছেন।"

ভগিনীপতির ঐশ্বর্য্যে শ্রীমান, তারিণীচরণ কমলরাণীর আজ্ঞা পাইয়া সটকার নলটা একজনের হস্তে তুলিয়া দিয়া অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। উপরের বারান্দার এক পার্শ্বে রেলিং ধরিয়া ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় কমলরাণী দাঁড়াইয়াছিলেন। ভ্রাতাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, পুষ্প কি তোমায় কিছু বলে গেছে, সন্ধ্যে তো অনেকক্ষণ হয়েছে—কই সেতো এখনও বাড়ী ফির্‌ল না?"

কমলরাণীর কথায় তারিণীচরণও যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "কই না, আমাকে তো কিছু বলে যায়নি। সন্ধ্যে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখনও সে কি বাড়ী ফেরেনি?"

কমলরাণী কন্যার জন্য বিশেষ ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি মুখখানি ম্লান করিয়া বলিলেন, "কখনও তো তার এমন হয় না,—আজ তার এত দেরী হবার কারণ কি! তুমি শিঘ্‌গির্‌ একজন লোক পাঠিয়ে খোঁজ নাও,—দেখ সে কোথায় গেল।"

ভগিনীর মুখখানি ম্লান দেখিয়া তারিণীচরণ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বিদ্যুতের মত তাঁহার চিত্তাকাশে চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। কথাটা যেন এক মুহূর্ত্তে প্রাণের ভিতরটা একেবারে পুড়াইয়া দিল। তাহার মনে হইল

নিশ্চয়ই গৌরীশঙ্কর রায় তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুষ্পকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। গৌরীশঙ্কর রায়ের শক্তি যে কত, তাহা তারিণীচরণের অবিদিত ছিল না। একই গ্রামে সেও জমিদার, গৌরীশঙ্কর রায়ও জমিদার, আয়ও সমান সমান না হই-লেও কেবল উনিশ বিশ মাত্র, অথচ গৌরীশঙ্কর রায়ের এত শক্তি, এত আধিপত্য কেন! সে গৌরীশঙ্কর রায়কে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না বলিয়াই তাহার উপর এত আক্রোশ। কিন্তু পরক্ষণেই গৌরীশঙ্কর রায়ের ভিতরটা তাহার চক্ষের সম্মুখে পড়িবামাত্র আবার তাহার মনে হইল:—না তাহা কখনই হইতে পারে না। গৌরীশঙ্কর রায় পরের কন্যা কখনই হরণ করিয়া লইয়া যাইবে না। গৌরীশঙ্কর রায়কে পত্রখানা লিখিয়া পর্য্যন্ত সে স্থির হইতে পারে নাই, উপরে যতই আস্ফালন করুক, ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে এবার মরিয়া, গৌরীশঙ্কর রায়কে অপদস্ত না করিয়া ছাড়িবে না। যে কথাটা তাহার প্রাণের ভিতর উঁকি দিল তাহা সে আর ভগিনীর সম্মুখে প্রকাশ করিল না, বরং নিজেকে বেশ একটু চাঙ্গা করিয়া বলিল, "চিন্তার কোন কারণ নেই, এখানেই কোথায় গেছে—এলো বলে। ঝি সঙ্গে আছে—ভয় কি! আর তাকে চেনে না, এ গাঁয়ে এমন কে আছে? কোন বিপদাপদ হ'লে কোন না কোন ক্রমে খবরটা নিশ্চয় এসে পৌঁছিত।"

কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহা বোঝে কই। কমলরাণী তাহাতে সুস্থির হইতে পারিলেন না, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "না দাদা,

আমার মনটা বড় অস্থির হয়েছে। তুমি শিগ্‌গির তার খোঁজে লোক পাঠাও।"

"আমি এখনি তার সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছি", বলিয়া তারিণী-চরণ ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় হইতেছিলেন, সেই সময় নীচে খুড়ীর বাজ্‌খাই গলা পঞ্চমে বাজিয়া উঠিল, "বলি এতক্ষণ ছিলি কোথা লা? বাড়ী শুদ্ধ লোক ভেবে অস্থির—ওর আর বেড়ান শেষ হয় না। সন্ধ্যে কখন হয়েছে তার কি হুস্ আছে! বয়স যত বাড়্‌ছে, মেয়ে তত খুকী হচ্ছেন!"

পুষ্প খুড়ীর চীৎকারে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হাসিতে হাসিতে মায়ের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারিণীচরণ পুষ্পকে দেখিয়া কমলরাণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই তো পুষ্প এসেছে।"

কমলরাণী কন্যাকে দেখিয়া অতি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত রাত্তির অবধি কোথায় ছিলি রে?"

মায়ের প্রশ্নে পুষ্প জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার জবাব দেওয়া হইল না। খুড়ী একেবারে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িলেন। যে দাসী পুষ্পের সঙ্গে গিয়াছিল সেও পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বলি ওই যেন ছেলেমানুষ, তুমিও তো বাছা একটা বুড়ো মাগী সঙ্গে ছিলে, তোমার তো একটা আক্কেল থাকা উচিত ছিল। পরের বাড়ী কাজ কর্ত্তে হ'লে একটু হুস করে চল্‌তে হয়। বাড়ী থেকে একবার বেরুলে আর যে ফিরতে হবে তা যে তোমাদের মনে থাকে না।"

খুড়ীর কথা তখনও শেষ হইবার অনেক বাকি ছিল, কিন্তু দাসী তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দিল না। সে খুড়ীর উপরেও আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া গলাটা বিকৃত করিয়া তাহার বাম হস্তখানা একেবারে খুড়ীর মুখের উপর নাড়িয়া বলিল, "তা আমরা কি করবো বাপু! তোমাদের মেয়েটী কেমন শান্ত—গুণ কত! চেনা নেই, জানা নেই, অমনি ফস্ করে একজন পর-পুরুষের হাত ধরা, তার সঙ্গে সে কি রঙ্গ ভঙ্গ, আমরা হ'লে ঘেন্নায় মরে যাই। ভাল কথা বলতে গেলুম, তা না মেয়ে একেবারে মারতে এলেন।"

দাসীর কথায় সে পর পুরুষটী কে তাহা বুঝিতে তারিণীচরণের বিলম্ব হইল না। ফস্ করিয়া একটা কথা ঊষার আলোর মত তারিণীচরণের চক্ষের সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া গেল। তবে কি পুষ্প গৌরীশঙ্কর রায়ের পৌত্রকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তাহার সহিত যদি পুষ্পের বিবাহ হয় তাহা হইলে তো তাহার জমিদারী করা, আরব্য উপন্যাসের আবুহোসেনের ন্যায় বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুচিয়া যাইবে। সে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিল, বেশ একটু তিরস্কার কণ্ঠে ভগিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা বল্‌তে কি, তুমিই বাপু মেয়েটীর মাথা খেয়েছ। এত বড় মেয়ে হ'লো, বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই নেই। মান সম্ভ্রম না ঘুচিয়ে আর ছাড়বে না দেখ্‌ছি। কাল থেকে আর ওকে মোটেই বাড়ী থেকে বেরুতে দেবে না।"

মামার নিকট তিরস্কার খাইয়া পুষ্প ছল ছল নেত্রে অঙ্গুলীর দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। খুড়ীর দৃষ্টি সেইদিকে পড়িবা-

মাত্র তিনি আর একবার জ্বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েটীর, তা মায়ের সম্মুখে বল্‌তে কি, সবই অলক্ষণ। এত বয়স হ'লো, আঙ্গুল দিয়ে মাটীতে আঁচড় কাটা যে কি অলক্ষণ তা বুঝলেন না। মেয়ে লেখা পড়া শিখেছেন কি না, তাই হাতে পায়ে যেখানে সেখানে লিখছেন।"

খিচুনীর চোটে খুড়ীর সম্মুখের দাঁত দুইটা বাহির হইয়া পড়িল। উনানে তিনি দুধ বসাইয়া আসিয়াছিলেন,সহসা তাঁহার সেই কথাটা মনে হওয়ায়,—সমস্ত বিষটা আর ছড়াইতে পারিলেন না, কেবল দংশন করিয়াই নিম্নে তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে হইল। তারিণী-চরণ পুষ্পের দিকে একবার তীব্র ভাবে চাহিয়া বলিল, "কমল, আর দেরী করা কিছু নয়; গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে ছেলেটীর সহিত সম্বন্ধ সে দিন নিয়ে এসেছিল আমি তার সঙ্গেই পুষ্পের বিয়ে দেব, আর কারু কথা শুন্‌বো না। শেষকালে কি একটা ঢলাঢলি হবে। আমি যত শিগ্‌গির্ পারি, ভাল দিন দেখে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে আসবো।"

তারিণীচরণ ভগিনীর আর উত্তরের প্রতিক্ষা না করিয়াই যেন একটু বিরক্তভাবে বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল। কমলরাণী এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা কহেন নাই, তিনি এইবার কথা কহিলেন, অতি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাস্তায় কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি রে?"

পুষ্প দ্বারের পার্শ্বে হেটমুণ্ডে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিরস্কার খাইয়া রাগে তাহার চোখের কোণে কেবলই জল আসিয়া

জমিতেছিল,—খেলো হইয়া যাইবার ভয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে তাহা এতক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু মায়ের কোমলস্বরে অভিমান আসিয়া তাহার সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না,—অশ্রু তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া কেবল ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমলরাণীর কোমল প্রাণ কন্যার চক্ষের জল সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহার জীবনের সাধ আহ্লাদ সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে। কেবল পৃথিবীর শেষ সম্বল এই একটী বন্ধন—স্নেহের প্রদীপ ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। তাঁহার সদাই ভয়, দম্‌কা বাতাসে কখন প্রদীপ নিবিয়া যায়। তাই তিনি সতত তাঁহার স্নেহের অঞ্চলে তাহাকে অতি সাবধানে ঢাকিয়া রাখিতেন। তিনি কি পুষ্পের অশ্রুজল সহ্য করিতে পারেন? কমলরাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া সস্নেহে পুষ্পের হস্ত ধরিয়া গৃহের ভিতর আনিলেন। অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"ছি মা, কাঁদতে আছে! ওরা তোমায় অন্যায় কিছু বলেনি তো। এত রাত্তির অবধি কি বাহিরে থাকা ভাল? রাস্তা ঘাটে যার তার সঙ্গে কথা কইলে যে লোকে নিন্দে করবে।"

পুষ্প অঞ্চল দিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "কই আমি তো যার তার সঙ্গে কথা কইনি মা, আমি সে দিন যাকে মাছ ধরে দিয়েছিলুম, তার সঙ্গে ত কথা কইছিলুম।"

কন্যার কথায় কমলরাণী মৃদু হাসিলেন; কহিলেন, "তোর

সঙ্গেই কি কথা কওয়া উচিত। দু দিন পরে তোমার বিয়ে হবে, এখন তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, এখন একজন পর পুরুষের সঙ্গে রাস্তার মাঝে আলাপ কল্লে লোকে যে মা তোমার নিন্দে করবে।"

পুষ্প মাতার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমি ত মা তাকে পর ভাবিনি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘটনাটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তারিণীচরণের আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকা অসম্ভব হইল। স্ত্রীলোকের মনের উপর একেবারেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। পাত্র ও বংশ সম্বন্ধে কমলরাণী যাহা খুঁজিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিলিয়া গিয়াছে. এ অবস্থায় তাঁহার মন নরম হইতে কতক্ষণ। তাহার উপর কন্যা যদি আব্দার ধরিয়া বসে, তাহা হইলে তো আপত্তি একেবারেই টিকিবে না, তাহা তারিণীচরণ বিলক্ষণ জানিত। ঘটনাটা আর অধিক নাড়াচাড়া খাইবার পূর্ব্বেই যেমন করিয়া হউক একটা জোড়া-গাঁথা করিয়া দিতেই হইবে। তারিণীচরণ সেই রাত্রিই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন,—কিন্তু লোক অল্লক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে "গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বাটী নাই।"

রাত্রে নানা চিন্তায় তারিণীচরণের নিদ্রা হইল না। রতন বোসের বৈঠকখানার সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান ছিল। রতন বোস যখন জীবিত ছিলেন, তখন এই উদ্যানটার যে বাহার ছিল, এখন আর তাহা নাই। যত্নের অভাবে অনেক বৃক্ষই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—ফোয়ারা আর জলোদ্গীরণ করে না; স্থানে স্থানে

আগাছারা দল বাঁধিয়া ছোট খাটো জঙ্গল করিয়া বেশ একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তারিণীচরণ সেই উদ্যানটার সম্মুখে পাইচারি করিতেছিল, আর এই সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটার পর একটা মৎলব আঁটিতেছিল। সেই সময় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আসিয়া হাজির হইল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী লোকটা বেশ নাদুস-নুদুস,—ঘটকালি তাহার পেসা। সৎ অসৎ সকল রকম পাত্রই দু'দশটা সর্ব্বদাই তাহার নিকট মজুত থাকিত। বোসেদের বাটীর সম্বন্ধটার উপর তাহার অনেক দিন হইতেই নজর ছিল। এই বিবাহটা লাগাইতে পারিলে আর এক বৎসর ভাবিতে হয় না, কিন্তু কোন পাত্রই কমলরাণীকে পছন্দ করাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বোসেদের বাড়ীর লোক যে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল সে সংবাদটা সে রাত্রেই পাইয়াছিল, তাই ভোর হইতে না হইতেই বোসেদের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখেই তারিণীচরণ। সে বেশ একটু মিহিস্বরে বলিল, "বাবু কি আমায় ডেকেছিলেন ?"

তারিণীচরণের তখন আর বাজে কথা বলিবার অবসর ছিল না। সে একেবারে কাজের কথা পাড়িল, "হাঁ, তুমি সেদিন যে পাত্রটীর কথা বলেছিলে তার সঙ্গেই পুষ্পের বিবাহ দেওয়াই মত হলো। তুমি আজই কলকাতায় রওনা হও, কথা বার্ত্তা একেবারে পাকা করে আসা চাই। আর যদি সুবিধে হয় পাত্রকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বে, যদি নেহাত তোমার সঙ্গে আসবার

অসুবিধা হয় যত শীঘ্র হয় আশীর্ব্বাদের একটা দিন স্থির করে আসবে। আমি সংবাদ পেলেই পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করে আসবো। এই মাসের মধ্যেই বিয়ে হওয়া চাইই।"

সহসা মত পরিবর্ত্তনের গূঢ় রহস্য কি তাহা জানিবার গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। কোন ক্রমে বিবাহটা লাগাইতে পারিলেই হয়; সে তাহার সুগোল ভুঁড়ীটিতে দুই তিন বার হাত বুলাইয়া বলিল, "সে পাত্রের আর ঠিকঠাক কি বাবু, সেতো ঠিক হয়েই আছে, আপনাদের অনুমতি হ'লে বিয়ে কোন কালেই হয়ে যেত। এ আমার বড়ায়ের কথা নয় বাবু—বিয়ে দেবার মত পাত্র বটে। দেখতে শুনতেও যেমন হৃষ্ট পুষ্ট, বিদ্যে বুদ্ধিও খাসা। আপনার ভাগ্নীর পাশে যা মানাবে,—আহা যেন শচীর পাশে ইন্দ্র।"

তারিণীচরণ গম্ভীর ভাবে বলিল,—"এস আমার সঙ্গে, আমি এখনি তোমার রাহা খরচের বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। তুমি এই সকালের গাড়ীতেই রওনা হও। শুভ কাজে দেরী করা কিছু নয়, আজকালের বাজারে ভালো ছেলে পাওয়াই দুর্ঘট, শেষ আবার হাত ছাড়া হবে!"

গোবিন্দ একগাল হাসিয়া বলিল, "যদি হাত ছাড়াই হবে, তবে আর আপনাদের অনুগ্রহে এত কাল কি ঘটকালি করলুম।"

তারিণীচরণ অগ্রসর হইতে হইতে বলিল,—"না না—বলা যায় না তো, তুমি এই সকালের গাড়ীতেই রওনা হও।"

রাহা খরচের আশায় তারিণীচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোবিন্দ

চক্রবর্ত্তীও অগ্রসর হইতেছিল, সে বলিল, "আজ্ঞে তাই হবে, আমি বাড়ী যাব আর রওনা হ'বো।"

তাহারা সবে আসিয়া বৈটকখানায় প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই সময় রসিকমোহন আসিয়া সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। রসিক তাহাদের অপরিচিত নহে। গ্রামের পাঁচ বৎসরের বালক হইতে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ সকলেই রসিকের পরিচিত। শ্মশানে যাইতে রসিক,—পরিবেশনে রসিক—সর্ব্ব ঘটেই রসিক আছে। এত প্রত্যূষে একেবারে বৈঠকখানার ভিতর রসিকের আবির্ভাব দেখিয়া তাহারা উভয়েই বিশেষ বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিল। তারিণীচরণের কুশ্রী মুখখানা একেবারে বিশ্রী হইয়া গেল। রসিক তাহার প্রিয় লাঠি গাছটী পাশে রাখিয়া গলার চাদরখানার দুইটা দিক দুই হাতে ধরিয়া তারিণীচরণের সম্মুখে আসিয়া বাগাইয়া বসিল। সে তাহার পাটভাঙ্গা সাদা ধপ্‌ধপে থানটার কোঁচাটা দুইবার ঝাড়িয়া গাওনা আরম্ভের পূর্ব্বে গায়কের ন্যায় একবার গলা খাকৃরি দিল।

তারিণীচরণ রসিকের ভাবভঙ্গিতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাবটা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া নিজেকে বেশ একটু গম্ভীর করিয়া যেন অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "রসিক যে! এত সকালে কি মতলবে।"

রসিক একবার গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দিকে বিকটভাবে চাহিয়া বলিল, "মতলব বড় জবর—ঘটকালি। একবার আপনার ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই।"

একেই তো রসিককে দেখিয়াই তারিণীচরণ জ্বলিয়া গিয়াছিল তাহার উপর ঘটকালির নামে সে যেন একেবারে খাপ্পা হইয়া গেল। বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "আমার ভগ্নীতো আর মেমসাহেব নয় যে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাইলেই সাক্ষাৎ হবে। আর কারুর ভিটে বাড়ীর প্রজাও নয় যে সংবাদ দিলেই সামনে এসে খাড়া হবে।"

রসিক তাহার জিহ্বাখানা প্রায় সবটাই বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল, সে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে আমি কি তাই বল্লুম। আপনি চটে যাচ্ছেন কেন? ছেলে যেমন মায়ের কাছে নিবেদন করে, আমি কেবল সেই ভাবে আমার যা বক্তব্য মার কাছে নিবেদন কর্ব্বো। আমি এ স্পর্দ্ধা কখনও রাখিনি যে বলি তিনি এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ান। দূর থেকে—আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্যটুকু শুন্‌বেন, বাস্ এই পর্য্যন্ত।"

তারিণীচরণ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "বাস্ এই পর্য্যন্ত টর্য্যন্ত এখানে চল্‌বে না। যদি তোমার কিছু বলবার থাকে আমায় বল্‌তে পারো;—আর বলবেই বা কি—তুমি যা বল্‌তে এসেছ, তার বিশেষ সুবিধে হবে না। পুষ্পের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। শিগ্‌গির পাকা দেখা হবে।"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিল, "ওইটুকু—শুধু ওইটুকু। আপনার ভগিনীর মুখে কেবল ওইটুকু শুনে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাব।"

তারিণীচরণ এবার রীতিমত রাগিয়া গেল,—সে চীৎকার করিয়া বলিল, "একি আব্দার নাকি? যা শোনবার তা আমার মুখেই শুনেছ, আর অধিক শুন্‌তে গেলে অপমান হতে হবে।"

"অপমান করে সে লোকটা কে হে" এই কথাটা রসিকের ঠোঁটের গোড়ায় একেবারে আসিয়া পড়িয়াছিল, আর একটু হইলে বাহির হইয়া গিয়াছিল আর কি, কিন্তু রায় মহাশয়ের কথাগুলো সহসা মনে পড়ায় সে ঢোক গিলিয়া খুব সামলাইয়া ফেলিল। রায় মহাশয় তাহাকে পই পই করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—রাগারাগি, বাদ-বিসম্বাদ মোটেই করিবে না। যদি ধরিয়া দু' ঘা প্রহার করে, তথাপি মুখ বুজিয়া চলিয়া আসিবে। কেবল যদি সম্ভব হয়, কমলরাণীর মুখ হইতে শুনিয়া আসিবে, তাঁহার এ বিবাহে মত আছে কি না? কাজেই রসিককে আবার জোর করিয়া মৃদু হাসিতে হইল; সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এ যে মশাই আপনার অন্যায় রাগ! আপনি তো আর মেয়ের মা নন্, আপনি যে মেয়ের মামা। একেবারে আসমান জমিন ফারাক। মার মুখ থেকেই কথাটা পাকা হওয়া ভালো নয় কি! কি বল চক্রবর্ত্তী?"

রসিককে যে রায় মহাশয় বিশেষ স্নেহ করেন, তাহা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর অবিদিত ছিল না। সে কি বলিবে? একদিকে তারিণীচরণ, অন্য দিকে গৌরীশঙ্কর রায়। এ অবস্থায় তাহাকে কোন কথা বলিতে হইলেই উলু খড়ের ন্যায় মারা যাইতে হয়। সে বুদ্ধিমানের ন্যায়, কোন উত্তর না দিয়া, হো হো করিয়া হাসিয়া একেবারে দুই পাটী দাঁত বাহির করিয়া ফেলিল। রসিকের কথাগুলা অপমানঠাসা বন্দুকের গুলির মত চামড়া ভেদ করিয়া তারিণী চরণের একেবারে বুকের ভিতর যাইয়া হৃদপিণ্ডে সজোরে আঘাত

করিয়াছিল। রাগে তাহার মুখ চোক লাল হইয়া গেল। সে ফরাসের উপর সবলে হাতখানা চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, —"তোমার যে বড় লম্বা লম্বা কথা হে। দেউড়ীতে যে দরয়ান বসে আছে, সেটা বুঝি একেবারেই খেয়াল নেই। তোমার ও বাঁকা চোরা কথাগুলো এখনি সোজা করে দিতে পারি, তা জান ?"

রসিক তাহার লাঠিটা চাপিয়া ধরিয়া একেবারে গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখুন মামা বাবু, আপনার এ কথায় যে রাগ করে না, সে মানুষ নয়। আমার এতক্ষণ রেগে কাঁই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি রাগারাগিতে আজ মোটেই নেই। স্পষ্ট কথা শুনুন,—আমি কমলরাণীর সঙ্গে দেখা না করে, এক পাও নড়ছিনি ;—দেখি কে নড়াতে পারে ?"

"দরয়ান" বলিয়া তারিণীচরণ একেবারে লাফাইয়া উঠিল, রাগে তাহার সমস্ত দেহটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "মামাবাবু, আপনাকে একবার বাড়ীর ভিতর মাঠাকুরুণ ডাক্‌ছেন।"

রাগের ধমকে দাসীর কথাগুলা তারিণীচরণের কর্ণে ভাল প্রবেশ করিল না। সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

দাসী পুনরায় বলিল, "আপনাকে একবার মা ঠাকুরুণ ডাক্‌ছেন।"

তারিণীচরণ বলিল, "আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি।"

দাসী চলিয়া গেল। তারিণীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোবিন্দ

চক্রবর্ত্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বোস গোবিন্দ, আমি এলুম বলে।"

তারিণীচরণ গমনোদ্যত হইলে, রসিক একবার শেষ চেষ্টা করিল,—"মশাই গো, আমার আর্জ্জিটা যেন পেশ করা হয়।"

তারিণীচরণ সে কথার কোন উত্তর দিল না,—সে রক্তিমনয়নে একবার রসিকের দিকে চাহিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল।

বাহিরের গোলযোগটা বেশ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তাহার সাড়া অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কমলরাণী যখন দাসীর মুখে শুনিলেন, যে একজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়, কিন্তু মামাবাবু আপত্তি করায় বৈঠকখানায় বেশ একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহার প্রাণটা কেমন বিচলিত হইয়া পড়িল। লোকটা কে,—সে কেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাকে বড়ই উদ্‌গ্রীব করিয়া দিল,—তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে দিয়া তারিণীচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভ্রাতা সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, বাহিরে এত গোলমাল কিসের?"

তারিণীচরণের রাগে তখন পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল; সে ক্রোধকম্পিতস্বরে উত্তর দিল, "গৌরীশঙ্কর রায়ের ওই যে সেই —মোসাহেবটা রসিক, সে এসে সকাল থেকে একেবারে বিরক্ত করে তুলেছে। গৌরীশঙ্কর রায় চান তার নাতীটির সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে হক্। সুখ কত, তা হলে রামজীবনপুরটা তাঁর একচেটে হয়ে যায়। দু'হাজার বার বল্‌ছি, তা হ'বে না—তবু নড়বে না।

সে চায় এই কথাটা তোমার মুখ দিয়ে শুনতে। আস্পর্দ্ধার কথা শুনে রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে।"

কমলরাণী মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "রায় মশায়ের নাতীটি শুনেছি না কি খুব ভাল ছেলে। তা বিয়ে দিতে আপত্তি কি?"

তারিণীচরণ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপত্তি! সেটা কি একটা ছেলে,—ঠাকুরদাদার আদরে আদরে ছেলেটার পরকাল একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। তুমি ক্ষেপেছ, তার সঙ্গে পুষ্পের বিয়ে দেব।"

কমলরাণী ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া সুস্থির কণ্ঠে কহিলেন, "তা রাগারাগি ঝগড়াঝাটির দরকার কি। তুমি দাদা তাকে ভেতরে নিয়ে এস। সে যদি সে কথাটা আমার মুখে শুনে সন্তুষ্ট হয়, শুনুক না, তাতে আমাদের আপত্তি কি?"

"সেই ভালো, কিন্তু দু কথা তুমি বেশ করে শুনিয়ে দেবে", বলিয়া তারিণীচরণ যেন মনে মনে বেশ একটু সন্তুষ্ট হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই রসিককে আনিয়া কমল-রাণীর সম্মুখে হাজির করিয়া দিল। কমলরাণী কপাটের অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। রসিক দ্বারের দিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, রায় মশায় আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। তাঁর নাতি আপনার মেয়েকে একটা আংটী দেওয়ায়, তারিণীবাবু রায় মশাইকে লিখেছেন যে, তাতে নাকি আপনার মর্য্যাদা হানি হয়েছে। তিনি বলেন, এক গাঁয়ে পাশাপাশি বাস, বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন কি! আপনার কন্যার সঙ্গে তাঁর নাতির বিয়ে

দিন, বোসেদের সঙ্গে রায়েদের চিরদিনের মত বাদ-বিসম্বাদ মিটে যাক। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, তাঁর নাতি পাঁচ পাঁচটা পাশ করেছে। পাত্র আপনার কন্যার অনুপযুক্ত নয়।"

রসিকমোহনের আগমন ব্যাপারটা খুড়ীর কর্ণেও গিয়াছিল,—দু' কথা ভাল করিয়া শুনাইয়া দিতে হইবে, একথাটাও তিনি শুনিয়াছিলেন, তাই নিঃশব্দে আসিয়া রসিকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহারই সুবিধা খুঁজিতেছিলেন। রসিকের বক্তব্য শেষ হইবা-মাত্র তিনি সম্মুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রসিকের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাপু গৌরীশঙ্কর রায়ের লোক না?"

সহসা রঙ্গস্থলে এ আবার কোন্ মূর্ত্তি—রসিক ঠিক ঠাওর করিতে পারিল না, সে বিস্মিত হইয়া খুড়ীর মুখপানে চাহিতে লাগিল। খুড়ী রসিককে নীরব থাকিতে দেখিয়া নিজেই আবার আরম্ভ করিলেন, "তা না হ'লে এমন বেহায়া পুরুষ মানুষ আর কে হবে? যেমন মনিব, তেমনি তার লোক। বোসেদের বাড়ী ঢুকতে একটু সরম হ'ল না?"

একেবারে খুড়ীকে রসিকের সম্মুখে বাহির হইয়া পড়িতে দেখিয়া তারিণীচরণের যেন একটু লজ্জা হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কি বকচ খুড়ী? তুমি তোমার নিজের কাজে যাও না।"

কিন্তু খুড়ী বুঝিলেন অন্যরূপ। তিনি ভাবিলেন, আরো একটু চড়া পরদায় ধরিবার জন্য তাঁহার দেবরপুত্র ইঙ্গিত করিল। তাই তিনি তাহার রসনায় আরো খানিকটা হলাহল মাখাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কেন ভয় কিসের? আমরা

গৌরীশঙ্কর রায়ের খাতকও নই, ভীটেবাড়ীর প্রজাও নই যে ভয় কর্‌বো। এখন যে চাকর দরওয়ান দিয়ে অপমান করিনি এই ঢের।"

দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খুড়ীর কাণ্ড দেখিয়া কমলরাণীর মাটীর সহিত মিশিতে ইচ্ছা হইতেছিল। তিনি কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লজ্জায়, ঘৃণায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। এই ঘৃণাস্কর কথাগুলা আর না কানে আইসে, সেই জন্য তিনি সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে মেজের উপর যাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

সে দিকে কেহই মনোযোগ করিল না। যাত্রার দলের অধিকারীর ন্যায় একটার পর একটা তান মারিয়া খুড়ী একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, "বিয়ে দেবে কেন,—কি দুঃখে! তার বিয়ে দেবার মুখে আগুন। সে বিয়ে দেওয়াতো সুধু নিজের কাজ হাসিল কর্‌বার জন্যে। তাহ'লে রতন বোসের সব বিষয়টা মুটোর মধ্যে আসে না—ও সব মতলব এখানে চল্‌ছে না। তোমাদের বাবুকে একটু হুস করে চলতে বল। তার নাতিটী তাঁর আদুরে গোপাল হ'তে পারে, কিন্তু সে তো আর কচি খোকাটী নয় যে ভদ্দর লোকের মেয়ের হাতে আংটী পরিয়ে,—রাস্তা ঘাটে হাত কাড়াকাড়ি করে আব্দার করে বেড়াবে। এই স্পষ্ট কথা শোন, রায়দের বাড়ীতে পুষ্প কখন পা খুতেও যাবে না।"

তারিণীচরণের নিকট অত অপমানিত হইয়াও রসিকমোহন

যাহার কথা শুনিবার জন্য মহা উৎসাহে অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার একটা কথাও শুনিতে পাইল না। সহসা যেন তাহার সম্মুখে তুবড়ী বাজীতে আগুন লাগিয়া কতকগুলা আগুনের তারা ফর ফর করিয়া বাহির হইয়া তাহার মুখ চোখ ঝলসাইয়া পুড়াইয়া কাল করিয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে আজ চন্দ্রমণ্ডল করিয়া খণ্ড-মেঘের মাঝখানে বসিয়া ধরার গায়ে রজত বসন পরাইয়া দিতেছিল। সুনীল আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই। রূপসী জ্যোছনা আজ যেন বিশ্ব বিপণীতে এক অপরূপ হাসির হাট বসাইয়াছে। আজ আকাশে হাসি ধরে না;—বাতাসে হাসি ধরে না—হাসিয়া হাসিয়া সমস্ত জগৎ যেন হাসির চরণে লুটাইয়া পড়িতেছে। রায়দের চক-মিলান অট্টালিকার বারান্দায় উপবিষ্ট তিনটী মানুষের মুখে কেবল হাসি নাই। অতি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রায় মহাশয় সটকার নলটা ধীরে ধীরে টানিতেছিলেন। আজ তাঁহার প্রাণের ভিতর চিন্তার সমুদ্র তাল পাকাইয়া পর্ব্বতের ন্যায় উচু হইয়া কেবলি আছাড় খাইয়া সমস্ত প্রাণটা আনচান করিয়া তুলিতেছিল। এতদিনে বুঝি ধা ফসকাইয়া যায়। ভরপুর আসরে বেমানপ্পাই তেহাই তুলিয়া কত শতবার অনায়াসে সোমে আসিয়া পড়িয়াছেন। জটিল ফৌজদারী মামলা উকিল কৌন্সীলের অপেক্ষা শীঘ্র মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, শেষ কি না ভাঙ্গা আসরে টপ্পা গায়কের নিকট সোম ফস্‌কাইয়া যাইবে,—তারিণীচরণের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে। তিনি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না,

যন্ত্রটা কোন সুরে বাঁধিবেন, খাদে, না চড়ায়! তাঁহারই ন্যায় তাঁহার সম্মুখে রসিকমোহন মুখখানা কালি করিয়া নীরবে বসিয়া আছে। সহসা শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে সেটার যন্ত্রণা হইতে আশু প্রতিকারের জন্য যেমন সমস্ত প্রাণটা আকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ একটা আকুলতায় তাঁহার সমস্ত মুখখানা ঢাকা। চাঁদের দিকে হতাশভাবে চাহিয়া একটু দূরে বসিয়া অখিলচন্দ্র যেন হতাশা-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় নিশ্বাস প্রবলবেগে পড়িয়া ঠাকুরদাদার অস্থির প্রাণ আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছে। সটকার তামাকু পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তথাপি কাহারও মুখে কথা নাই।

ঠাকুরবাড়ীতে গোপীনাথের আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,—রায় মহাশয়ের যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। মস্তক অবনত করিয়া ঠাকুরবাড়ীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। রায় মহাশয়কে উঠিতে দেখিয়া রসিক যেন জোর করিয়া কথা কহিল; বলিল, "বড়কর্ত্তা বলুন, এখন কি করবেন স্থির করলেন। কামানের আওয়াজ তবু সহ্য হয়, এ মাছির ভনভনানি অসহ্য।"

ভৃত্য সটকার কলিকা বদলাইয়া দিয়া গেল। রায় মহাশয় সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "শেষে রসিক তুমি অপমান হয়ে ফিরে এলে—"

রসিক গর্জ্জিয়া উঠিল,—তাহার ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর রায় মহাশয়কে কথা কহিতে দিল না,—কহিল, "আমি

তো লাঠি ধরেছিলেম, আপনার কথাগুলো মনে হওয়াতেই যত গোল বাধালে। বড়কর্ত্তা, আপনি হুকুম দিন, আমি একবার ব্যাটাকে দেখে নিই।"

রায় মহাশয় রসিকের কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি অখিলচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভায়া যে একেবারে নীরব হয়ে গেলে, তুমি কি বল।"

অখিলচন্দ্রের মনটা তখন হতাশের পইটায় চড়িয়া একেবারে চন্দ্রলোকের মরুভূমিতে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল,—তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "চলুন দাদামশাই, বেরিয়ে যাওয়া যাক্।"

রায় মহাশয় বিস্মিত হইয়া পৌত্রের মুখের দিকে চাহিলেন,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেরিয়ে যাব কোথায় হে?"

অখিলচন্দ্র সেইভাবেই হতাশের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বনে! দাদামশাই, কমণ্ডলু চিমটে নেওয়া যাক্,—গেরুয়া পরা যাক্—সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাই চলুন,—না, আর নয়।"

রায় মহাশয় নাতির কথায় অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। বলিলেন, "বল কি! বনে যাব সে কি হে।"

অখিলচন্দ্র গলাটা বেশ চড়াইয়া বলিলেন, "সে কি হে! পৃথিবীর উপর দাদামশাই একেবারে ঘেন্না হয়ে গেছে।"

রসিক বলিয়া উঠিল, "যথার্থ! চলুন ছোটবাবু, আমিও বনে যাব। যদি তারিণীচরণের অপমান হজম কর্ত্তে হয়, তার চেয়ে বনে যাওয়াই ভাল। বড়কর্ত্তা, ছোটবাবু যথার্থ কথাই

বলেছেন। এর চেয়ে আমাদের বনে যাওয়া একশো গুণে ভাল।"

অখিলচন্দ্রের কথাটা যেন ভিতর হইতে বাহির হইল,—গলাটায় বেশ গম্ভীর আওয়াজ হইল, "রসিকবাবু মুনি ঋষিরা সব বনে যেত কেন জানেন ? শুধু ঘেন্নায়। সংসারের উপর ঘেন্নায়,—মানুষের উপর ঘেন্নায়,—এমন কি, ভগবানের উপর পর্য্যন্ত তাঁদের ঘেন্না হয়ে যেত। যখন শান্তিই গেল, তখন কি নিয়ে আর মানুষ সংসারে থাকবে। না আমায় বনে যেতেই হবে।"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিল, "নিশ্চয়ই ! বড়কর্ত্তা আপনিতো ছোটবাবুর কোন সাধই অপূর্ণ রাখেননি, এ সাধটাও অপূর্ণ রাখবেন না। এখনি দাওয়ান মশাইকে ডেকে যাবার বন্দোবস্ত করুন। কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়বো।"

রায় মহাশয় তথাপি কোন উত্তর দিলেন না ; তিনি নীরবে সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন। রায় মহাশয়কে নীরব দেখিয়া রসিক আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই সময় কালি ভড় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দলাদলি ফৌজদারী পাকাইতে কালি ভড় অদ্বিতীয়। বহুদিন সে রায় মহাশয়ের আসর হইতে অনুপস্থিত ছিল। আজ একটা মস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়া না আসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার গায়ে একটা সার্ট তাহাও অতিশয় মলিন। ঝুল নাই বলিলেই হয়। ইস্ত্রিবিহনে সার্টের কাপগুলি কুঞ্চিত হইয়া তাহার কুঞ্চিত দেহের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে।

গলায় একখানা জরাজীর্ণ কথঞ্চিৎ ফরসা উড়ানী, পায়ে একজোড়া কালি বুরুসের ফিতা বাঁধা জুতা। মাথায় উস্কু খুস্কু পাকা চুল। বহুদিন কামানো অভাবে সাদা কালো খোঁচা খোঁচা দাড়ীতে মুখখানা ভরা। সে জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিল, "তারপর শুনেছ রসিকমোহন, ওদিক্‌কার খবরটা। তোমার ওই আস্ত মাথাটা, আর যে হাতে আংটী পরান হয়েছে, সেই কাঁচা হাতখানা যে এনে দিতে পারবে তাকে ও বাড়ীর তারিণীচরণ হাজার টাকা দেবে। রায় মহাশয়ের নাতির কাঁচা হাতখানা চায়; হাঁ—বুকের পাটা বটে।"

রসিক যেন ইস্প্রিংএর পুতুলের মত লাফাইয়া উঠিল,—তাড়াতাড়ি তাহার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া কালি ভড়ের হাতখানা সজোরে টানিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "চলতো দেখি হে, সে লোকটা কে? মাথাটা নেয়।"

আকস্মিক টানে কালি ভড় দুই তিন হাত দূরে যাইয়া পড়িল, তাহার পদস্থিত জুতার যে পাটীর ফিতা খোলা হইয়াছিল তাহা পা হইতে বাহির হইয়া একেবারে বারান্দার নীচে গিয়া পড়িল। সে উবুড় হইয়া পড়িতে পড়িতে কোন ক্রমে বাঁচিয়া গেল। সে আসিয়াছিল কেবল আগুনটা ধরাইবার জন্য। সে একেবারেই জানিত না যে, অগ্নি বহুক্ষণ হইতেই ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল তাহার এক ফোঁটা কেরসিন তৈল পাইবামাত্র তাহা এরূপভাবে জ্বলিয়া উঠিবে। কালি ভড় একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সহসা ধাক্কা খাইয়া সে গ্রীষ্মকালের শুষ্ক পত্রের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,

রাগে সব কথা তাহার পরিষ্কার বাহির হইল না,—চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া তীব্রভাবে বলিল, "আচ্ছা গোঁয়ার লোকতো হে। তোমার মত লোকের মাথাটা যাওয়াই উচিত—"

রসিক আবার যাইয়া তাহার হাত ধরিয়াছিল, সে ছাড়িবার পাত্র নহে। চীৎকার করিয়া বলিল, "মাথা নেয় রসিক-মোহনের! রতন বোস সব কল্লে, আজ কিনা তার সম্বন্ধি নেয় মাথা। ও হচ্ছে না—তোমায় যেতেই হবে—"

কালি ভড় রসিকের আচরণে একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল,—সে মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে আচ্ছা লোকতো। ছাড় না হাত, জুতাটা আনি।"

রায় মহাশয় ভড়ের অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া বলিলেন, "কি কর রসিক, ভদ্রলোককে জুতো আনতে দাও না।"

রায় মহাশয় আবার গম্ভীর হইলেন। রসিক কালি ভড়ের হাত ছাড়িয়া দিল। সে বিরক্তভাবে তাহার জুতা পাটী কুড়াইয়া আনিয়া রায় মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া বসিয়া হাকিল, "ওরে কে আছিস্ এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা।"

রসিক তখনও বসে নাই, সে বলিল, "ও তামাক ফামাক চলবে না;—তোমায় যেতে হবে।"

কালী ভড় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আর বড়ায়ে কাজ নেই, তোর যত মুরোদ তা বোঝা গেছে। আমি যদি হতুম তা হ'লে ওই খুড়ীর নাকটা কামড়ে ছিড়ে নিয়ে আস্‌তুম!"

কালি ভড়ের নাক কামড়াইবার ভঙ্গিমায় মুখের ভাবটা এমনি

কদর্য্য হইল যে তাহা মানুষের মুখ বলিয়াই আর বোধ হইল না। অখিলচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এমন বিকৃত মানুষ যেখানে বাস করে, সেখানে থাকার চেয়ে বনও সহস্রগুণে ভালো।"

তিনি বিরক্ত দৃষ্টিতে কালি ভড়ের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "মানুষ এমনও কদর্য্য হয়", বলিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পৌত্র বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল, রায় মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু আজ আর তাহাকে তিনি বসিতে বলিলেন না। আজ যেন সমস্ত যুক্তিগুলা দল বাঁধিয়া বিদ্রোহ হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মার ভিতর থাকিয়া থাকিয়া বিদ্রুপ করিয়া উঠিতে লাগিল। কালি ভড়ের কথাটা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। 'কাঁচা হাতখানা' তখনও তাঁহার কর্ণের গোড়ায় মান অপমানের ঊর্দ্ধে যাইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল। রসিক তাহার মুখখানা গোঁজ করিয়া আবার আসিয়া স্বস্থান দখল করিল। কালি ভড় বলিল, "রায় মশাই! ও বাড়ীর তারিণীচরণের আস্পর্দ্ধার কথাটা শুনে আমি একেবারে অবাক হ'য়ে গেছি। খবরটা না জানিয়ে থাকতে পারলেম না, তাই ছুটে আসছি। এর একটা এখনি ব্যবস্থা করা উচিত।"

একটা জুতসই উত্তরের প্রত্যাশায় কালি ভড় রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু রায় মহাশয় একটীও কথা কহিলেন না, নীরবে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। ব্যাপারটা ভাল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কালি ভড় রসিকের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

—·০/০·—

রাগ যখন চরমসীমায় যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা ভগবানের ন্যায় "অবক্তম" হইয়া দাঁড়ায়। তখন ভাষা এমনই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে যে, তাহাকে আর কিছুতেই টানিয়া বাহিরে আনা যায় না। কাহারও বা চক্ষু ফাটিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া পড়ে, কাহারও বা দাহটা ভিতরে হইয়া চোক মুখ লাল হইয়া যায়। খুড়ীর কাণ্ডে কমলরাণীরও তাহাই হইল। একটা দুর্জ্জয় ঘৃণায় তাঁহার রাগের সীমা গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া পড়ায় তিনি একবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কেবল দুই ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া ভিতরের দাহটা তবু অনেকটা লঘু করিয়া দিল। ভাল কি মন্দ তিনি কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু তাহার ফল দাঁড়াইল বিপরীত। ভগ্নীর মনের মতন হইয়াছে ভাবিয়া তারিণীচরণ পুষ্পের বিবাহ পাকা করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল,—আর একটা মস্ত কাজ করিয়াছেন, যাহা বোস বংশের কেহ কখনও ইতিপূর্ব্বে সাহস করিয়া করিতে পারে নাই, ভাবিয়া খুড়ী একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিলেন।

সেই ঘটনাটার পর তিন চারি দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু কমলরাণী এখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। মধ্যাহ্নের

পর তিনি তাঁহার শয়ন কক্ষে বসিয়া সেই ঘটনাটারই কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন ;—আর ভাবিতেছিলেন, ঘটনাটার জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি যদি রসিকমোহনকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিতে না বলিতেন, তাহা হইলে বাহিরের ঘটনাটা বাহিরে বাহিরেই চুকিয়া যাইত, তাহার কালি এমন করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ছিট্‌কাইয়া লাগিত না। সামান্য একটা ঘটনা, বিনা কারণে মানুষ কেমন করিয়া এমন ভাবে তাল পাকাইয়া তুলে তাহাই ভাবিয়া কমলরাণী সেই দিন হইতে একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্থির জানিতেন এরূপ অপমানিত হইয়া রায় মহাশয় কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তাই একটা কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতেছিলেন। সেই সময় তারিণীচরণ মহা ব্যস্ততার সহিত আসিয়া সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। সে আজ দুই তিন দিন বাড়ী ছিল না ; যাইবার সময় কোথায় যাইতেছে তাহাও কাহাকে বলিয়া যায় নাই। জমিদারীর কার্য্যের জন্য প্রায়ই তাহাকে সদরে যাইতে হইত, সকলেই ভাবিয়াছিল কোন কার্য্যের জন্য বোধ হয় সে সদরে গিয়াছে ; তাই সে বিষয় তাহাকে কেহ আর বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই।

একেবারে রেলের পোষাকে, কাপড় চোপড় না ছাড়িয়াই ব্যস্ততার সহিত ভ্রাতাকে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কমলরাণী বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন ; কি যেন একটা কিসের আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ব্যাকুল

ভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন। তারিণীচরণ মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কমল, আমি একেবারে পাত্র আশীর্ব্বাদ করে এলুম। সুন্দর ছেলে, অতি সৎবংশ, যত্ন খাতির আমায় যথেষ্টই করেছে। আগামী মাসের ১৮ই দিনটা নাকি খুব ভালো, তাই সেই দিনই বিয়ে স্থির করে এলুম।"

তারিণীচরণ কথাগুলা এমনি তাড়াতাড়ি বলিল, যে কথা-গুলা অর্দ্ধেক বাহির হইল, অর্দ্ধেক মুখের মধ্যেই রহিয়া গেল। কমলরাণী এতক্ষণ নীরব হইয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া কথা-গুলা শুনিতেছিলেন,—কিন্তু কিছুই ভালো পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশীর্ব্বাদ করে এলে! কাকে আশীর্ব্বাদ করে এলে দাদা,—কার বিয়ে?"

ভগ্নীর কথায় তারিণীচরণ যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন. বেশ একটু অবাক হইয়া বলিল, কাকে আশীর্ব্বাদ করে এলুম কি! পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করে এলুম। সেই যে পাত্রটীর কথা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বলেছিল। খাসা পাত্র, যখন জামাই দেখ্‌বে তখন তোমায় নিশ্চয়ই বল্‌তে হবে, না দাদা একটা জামাই করে দিলে বটে। যেমন চরিত্র,—তেমনি বিদ্যে বুদ্ধি!"

কমলরাণী এতক্ষণে সমস্তটা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাকে বিন্দুমাত্র কোন কথা না জানাইয়া একেবারে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া আসায় তিনি ভ্রাতার উপর মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যেন একটা তীব্র অভিমান আসিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতরটায় সজোরে আঘাত করিল, তিনি অতি ম্লান ভাবে বলিলেন, "দাদা!

আমাকে মোটে কিছু না জানিয়ে তোমার পাত্রকে একেবারে আশীর্ব্বাদ করে আশা ভাল হয়নি। মেয়ের বিয়ে, সব দিক ভাল করে না দেখে এতটা তাড়াতাড়ি করা কিছুতেই আমার ভালো ব'লে বোধ হয় না।"

তারিণীচরণ ভগ্নীর কথায় একেবারে দমিয়া গেল। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি কি এমনই কাঁচা যে সব দিক না সন্ধান নিয়েই পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করে এলেম। পুষ্প আমার শত্রুর মেয়ে কি?—সে যে আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশী।"

কমলরাণী কোন কথা কহিলেন না, তিনি নীরবে অবনত মস্তকে মেজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারিণীচরণ একট নীরব থাকিয়া অভিমান জড়িত স্বরে আবার বলিল, "তোমায় না জিজ্ঞাসা করে পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করে আসা আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে, আমি এখনই পত্র লিখে বারণ করে দিচ্ছি। তুমি যদি নিজে দেখে শুনে দাও সে তো ভাল কথা। তাহ'লে আমিও দায় থেকে মুক্ত হ'তে পারি,—একি আমার কম ঝক্কি। শেষ আর বলতে পারবে না, দাদা আমার এই সর্ব্বনাশ কল্লে। দেখলুম পাত্রটী ভাল, তাই আশীর্ব্বাদ করে এসেছি।"

তারিণীচরণের ক্ষুণ্ণভাব কমলরাণী লক্ষ্য করিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "দাদা আমি কি তোমায় তাই বল্লুম তুমি যখন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছ তখন আর কথা নেই। তোমার চেয়ে আপনার এখন পৃথিবীতে আর আমার কে আছে?"

ভগ্নীর কথায় আনন্দে তারিণীচরণের মুখখানা ভরিয়া গেল,

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "আমি যখন ভার নিয়েছি বোন, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক। জামাই দেখে যদি পছন্দ না হয়, তখন তোমার যা ইচ্ছে আমায় ব'লো। মোটে আর কুড়ি বাইশ দিন সময় আছে, এরই মধ্যে সব বন্দোবস্ত ঠিক কর্ত্তে হবে। আমাদের সাত নয় পাঁচ নয় একটা মেয়ে—সবই কর্ত্তে হবে। আমি চল্লেম, সন্ধ্যার পর ধীরে সুস্থে বসে সে বিষয় একটা পরামর্শ করা যাবে।"

তারিণীচরণ চলিয়া গেল, কমলরাণী আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা, তাহার সুখ দুঃখ যাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—তাহার গুরুত্বটা এত বড় যে তাহা তিনি প্রাণের ভিতর আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না! ভাবনার পর ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে একেবারে ভাবনার বাহিরে আনিয়া ফেলিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে একটা তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, কোন বড় লোকের বিদ্বান পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন, কিন্তু আজ সেই ইচ্ছাটাকে জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিতে তাঁহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, কন্যার অকল্যাণ হইবার আশঙ্কায় তিনি তাড়াতাড়ি তাহা অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন, মনে মনে বলিলেন, বিশ্বনাথের মনে যা আছে তাই হবে।

রামজীবনপুরের অতি সন্নিকটে একটা শিবের মন্দির আছে। মন্দিরটা 'বুড়ো-শিবের' মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্দিরটা বহু প্রাচীন,—কত কাল হইতে এই মন্দিরে বুড়ো শিব অবস্থান করিতেছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না! মন্দির সম্বন্ধে বহু-

জনশ্রুতি বহুদিন হইতে লোকের মুখে মুখে বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহার সত্য মিথ্যার যদিও কোন অকাট্য প্রমাণ নাই, কিন্তু মন্দিরের দেবতা যে জাগ্রত, তাহার ভূরি ভূরি জীবন্ত—জ্বলন্ত প্রমাণ গ্রামের আশপাশের গ্রামবাসিগণ সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বুড়োর এমনি মাহাত্ম্য যে, যে কেহ তাঁহার দ্বারে যাইয়া যাহা কিছু প্রার্থনা করুক, একেবারে তাহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় না।

কমলরাণী তাঁহার একমাত্র কন্যা পুষ্পের মঙ্গল কামনায় প্রায়ই বুড়োর মস্তকে পুষ্প বিল্বপত্র চড়াইয়া আসিতেন। যখন কোন প্রবল যন্ত্রণায় তাঁহার মনের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িত— তখনই তিনি এই বুড়োর মন্দিরে ছুটিতেন। তাঁহার চরণে সমস্ত বেদনা সমর্পণ করিয়া যেন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন,—অলক্ষ্যে থাকিয়া বুড়োর হাতখানা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শান্তি-প্রলেপ মাখাইয়া দিত। কন্যার একটি সুপাত্রের জন্য তিনি বহুদিন হইতেই বুড়োকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন,—বুড়ো হইয়া ভ্রমবশতঃ যদি বিস্মরণ হইয়া থাকেন, সেই আশঙ্কায় সেটা আবার স্মরণ করিয়া দিবার জন্য বুড়োর মন্দিরে যাইতে তাঁহার প্রাণ আজ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ইচ্ছাটা যদি অনিচ্ছাসত্বে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই মনটাকে কিছুতেই চাঙ্গা করিয়া তুলিতে পারে না। বিবাহ ভগবানের হাত প্রভৃতি নানাবিধ প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াও কমলরাণী কিছুতেই একেবারে

মনটাকে সাদা করিতে পারিলেন না ;—মুখে প্রকাশ না করিলেও আজ মনটা তাঁহার একেবারেই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর বুড়ো শিবের মন্দিরে রওনা হইলেন।

কমলরাণীর শিবিকা ও বরকন্দাজ দেখিয়া মন্দিরের আশে পাশের লোক সরিয়া যাইতে লাগিল,—শিবিকা মন্দিরের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। আসল মন্দিরের সম্মুখে একটা নাটমন্দির,—সেই স্থানে চর্ম্মপাদুকা রাখিয়া নগ্নপদে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। কমলরাণীর শিবিকা আসিয়া সেই নাট মন্দিরের সম্মুখে থামিল ;—কমলরাণী বসনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কন্যার হস্ত ধরিয়া পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন। পুষ্প পাল্কী হইতে বাহির হইয়া মস্তক তুলিয়াই নাটমন্দিরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসিতে হাসিতে সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "বা বেশ তো মজা! তুমি কখন এলে?"

বাঙ্গালা দেশের একটা প্রবাদ আছে, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।' আজ অখিলচন্দ্রও বুড়ো শিবের মন্দির দেখিতে আসিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত গৌরীশঙ্কর রায়ের পৌত্রকে মন্দিরের অলৌকিক ঘটনাগুলা না শুনাইয়া ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি মহা সমাদরে অখিলচন্দ্রকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাজ-সরঞ্জাম একে একে সমস্ত দেখাইয়া, ক্রমে ক্রমে বেশ গুছাইয়া সকল

অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা করিলেন। অখিলচন্দ্র পূজারীর মুখে সেই সকল অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তাহাও তাঁহার খেয়াল ছিল না—তিনি নাট মন্দিরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, আর পূজারী অনর্গল একটার পর একটা, অদ্ভুত কিম্ভূত ঘটনার অবতারণা করিতেছিলেন। সহসা পুষ্পের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র অখিলচন্দ্রের সমস্ত দেহটা কে যেন সজোরে নাড়িয়া ঘুরাইয়া দিল, সম্মুখে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার চক্ষের তারা দুইটা পুষ্পের চক্ষুর সহিত মিলিত হইল। পুষ্প তাহার সেই মধুর হাসি হাসিয়া কমলরাণীকে দেখাইয়া আবার বলিল, "ইনি আমার মা।"

অখিলচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে নাটমন্দির পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু 'ইনি আমার মা' শুনিয়া তাঁহাকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইল। ইঁহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, কি করা কর্ত্তব্য নয়, তাহা বিবেচনা করিবার আর সময় পাইলেন না! তাঁহার মাথাটা 'মা' শুনিবামাত্র আপনি যেন নত হইয়া পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি কমলরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"আর একটু হ'লেই বলে ফেলেছিলুম আর কি!"

ঝড়ের মত অখিলচন্দ্র বৈটকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। বৈটকখানার ফরাশের উপর বসিয়াছিলেন রায় মহাশয় ও রসিক-মোহন। উভয়েই মহা উদ্‌গ্রীব ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহি-লেন। কথাটা সব শুনিবার জন্ম কেহই কোন কথা কহিলেন না। অখিলচন্দ্র তাঁহার ঠাকুরদাদার সম্মুখে আসিয়া ফরাশের উপর বসিতে বসিতে পুনরায় বলিলেন, "খুব সামলে গেছি দাদামশাই,—আর একটু হ'লেই মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েছিল আর কি!" গৌরী শঙ্কর রায়ের বৈটকখানা একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল,—যেখানে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত একটা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার চলিত—সেখানে একেবারে নীরব—নিস্তব্ধ। রণস্থলে সহসা সেনা-পতি বন্দি হইলে সৈন্যগণ যেমন ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়ে,—সেইরূপ রায় মহাশয়ের বিরাট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গিগণও একে-বারে মুসড়াইয়া গিয়াছিল। কেহ আর বড় একটা সন্ধ্যারপর তাঁহার বৈটকখানায় উপস্থিত হইত না। তিনিও আর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বৈটকখানায় বসিতেন না। যে ফরাশের উপর বসিয়া পরচর্চ্চা,—দলাদলির তুফান বহিয়াছে, তাহা হলদিঘাটের মত শূন্য পড়িয়া হাহাকার করিতেছে।

প্রথম প্রথম গ্রামের বিখ্যাত বিখ্যাত উৎসাহদাতাগণ কথা-টাকে নাড়িয়া চাড়িয়া রায় মহাশয়কে উত্তেজিত করিবার জন্য একেবারে আড়েহাতে লাগিয়াছিল কিন্তু কোনদিকে কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা শেষে একেবারে বিরক্ত হইয়া রায় মহা-শয়ের বৈটকখানা পরিত্যাগ করিয়াছে। রায়েদের সহিত বোসেদের বিবাদ বাধিয়াছে, এ সংবাদটা গ্রামে রাষ্ট্র হইবামাত্রই গ্রামের প্রায় সকলেই বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। বড়লোকে বড়-লোকে একটা কিছু বাধিলেই দুই পয়সা হস্তগত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু রায় মহাশয় যে এমন ভাবে নীরব থাকিয়া ব্যাপারটা একে-বারে পণ্ড করিবেন, তাহা কেহই ধারণায় আনিতে পারে নাই। তাহারা এজন্য রায় মহাশয়ের উপর শুধু বিরক্ত হয় নাই, রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কালি ভড় তো সামলাইতে না পারিয়া হাটের মাঝে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, "গৌরীশঙ্কর রায়টা একেবারে কাজের বাইরে গিয়েছে। বুড়ো হাতী—শুধু দাঁত সার।"

এ কথাটাও যে গৌরীশঙ্কর রায়ের কানে আসে নাই তাহাও নয়,—তিনিও কথাটা শুনিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নীরব। পাছে একটা বেফাস কথা বাহির হইয়া সবদিক পণ্ড করিয়া দেয়—সেই আশঙ্কায় তিনি একেবারেই কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যাহা দুই একটা কহিতেন, তাহা কেবল রসিকমোহনের সঙ্গে। রসিকমোহন পূর্ব্বে যেমন রায়েদের বাটী আসিত, এখনও সেইরূপ আসিতেছে। তবে আর তাহার সে স্ফূর্ত্তি—সে উৎসাহ নাই। সে যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। তবে নাকি তাহার

রায় মহাশয়ের উপর বড় আস্থা, তাই সে আজও নীরবে তারিণী-চরণের অপমানটা সহ্য করিতেছিল। তাহার বড় আশা ছিল, নিশ্চয়ই ছোটবাবুর সহিত কমলরাণীর কন্যার বিবাহ হইবে এবং সে সেই বিবাহ-রাত্রে বড় গলা করিয়া তারিণীচরণকে বলিবে, "ওগো মশাই এখন তোমার দেউড়ীর দরয়ান গেল কোথায় ?"

কিন্তু যখন তাহার সে আশাটার মুখেও ছাই পড়িবার মত হইল,—যখন সে শুনিল তারিণীচরণ পুষ্পের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, এমন কি আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে,—১৮ই শ্রাবণ বিবাহ; তখন আর সে কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে; তাই সে আজ ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু রায় মহাশয়ের বিরাট গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে কথাটা তুলি তুলি করিয়াও এতক্ষণ তুলিতে পারে নাই। সে কথাটা তুলিতে যাইতেছিল,—এমন কি তাহা একবারে তাহার ঠোঁটের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; সেই সময় অখিলচন্দ্র কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা মহা প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া তাহার সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল। বহুদিন পরে আবার আজ পৌত্রের মুখে হাসি দেখিয়া রায় মহাশয়ের প্রাণটা যেন একটু সাদা হইয়া উঠিল,—ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাঁহার বড় কৌতূহল হইল, তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না—মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রকম ভায়া ?"

অখিলচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদামশাই! বুড়ো শিবের নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে তাঁর পূজোরীর সঙ্গে কথা কইছি, সেই

সময় একখানা পাল্কী এসে হাজির। পাল্কীর ভেতর থেকে কে বেরোল জান,—একেবারে মা আর মেয়ে।”

রসিক লাফাইয়া উঠিল, “বুড়ো শিবের মন্দিরে ‘মা আর মেয়ে,’ বলেন কি ছোট বাবু! কথাটা পাকা করে এসেছেনতো?”

অখিলচন্দ্রের মুখখানা গম্ভীর হইয়া পড়িল,—তিনি মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, “পাকা আর হলো কই, রসিকবাবু! ঐ লজ্জা এসেই সব মাটী করে দিলে।”

রায় মহাশয় আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “তাহ’লে সুবিধে হ’লো না ভায়া?”

অখিলচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আসিয়া বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রসিকের ভিতরটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সে মুখখানা বিকৃত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। অখিলচন্দ্র তাঁহার এমন কবিত্বের মাঝখানে এই অপরিচিত সুলোম ভুঁড়িরূপ বিঘ্ন দেখিয়া একেবারে মহা বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। রায় মহাশয় সট্‌কার নলটা টানিতেছিলেন,—তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “এস চক্রবর্ত্তী! তারপর খবর কি? তোমার যে আর দেখাই নেই।”

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ফরাশের উপর বসিতে বসিতে বলিল, “আজ্ঞে বোসেদের বিয়েটার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম, তাই আর আসা ঘটে উঠেনি।

রায় মহাশয় বলিলেন, "তাহ'লে রতন বোসের মেয়ের বিয়ে কি পাকাপাকি হ'ল হে?"

বিবাহের সে নিজেই ঘটক, কাজেই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী একটু যেন গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে যখন আশীর্ব্বাদ হয়ে গেছে তখন একরকম পাকাই বল্‌তে হবে বই কি?"

রায় মহাশয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্বন্ধটা কল্লে কে হে,—তুমিই নাকি?"

রায় মহাশয়ের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যেন একটু সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। সে মুখখানা কাচুমাচু করিয়া বলিল, "আমি একটা নিমিত্ত মাত্র—যাঁর কাজ তিনিই কচ্ছেন।"

রায় মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না—নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সট্‌কার নলটা টানিতে লাগিলেন। বাহিরের জমাট অন্ধকার তাঁহার চখের সম্মুখে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ভিতরের অন্ধকারটাকে আরও বিরাট করিয়া তুলিল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী রায় মহাশয়ের মুখ হইতে একটা কিছু শুনিবার আশায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি রায় মহাশয়কে নীরব থাকিতে দেখিয়া তাহাকেই আবার কথা পাড়িতে হইল, সে ভয়ে ভয়ে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "একটী পরমা সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পেলেম, তাই আপনাকে সংবাদ দিতে ছুটে আসতে হ'লো; আপনি যেমনটি চান, পাত্রীটিও হুবহু তাই। যদি অনুমতি হয়, একবার দেখাবার বন্দোবস্ত করতে পারি।"

রসিক এতক্ষণ নীরবে বসিয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর এই বিষবৎ কথাগুলি শুনিতেছিল। কিন্তু আর নীরব থাকিতে পারিল না। যেন কাটা ঘায়ে লবণ ছিটাইয়া পড়িল, সে একেবারে বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, "আর কাজ কি পাত্রী দেখিয়ে, সরে পড় না। যথেষ্ট হয়েছে।"

রসিকের বিকট আওয়াজে চক্রবর্ত্তী যেন একটু দমিয়া গেল। কিছু দিন পূর্ব্বে, একদিন কথায় কথায় রায় মহাশয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার পৌত্রের জন্য একটী পাত্রীর সন্ধানে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুবিধামত পাত্রী না জুটায় সেই পর্য্যন্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আর রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। সম্প্রতি একটা দরিদ্রের অলোকসামান্যা কন্যার সন্ধান পাইয়া সে রায় মহাশয়কে সেই সংবাদটা দিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল,—ভাবিয়াছিল, এই মনোমালিন্যের সময়ে সম্বন্ধটা লাগিলেও লাগিতে পারে। যদি কোনক্রমে এই দুইটা বিয়ে এক সঙ্গে লাগাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর এক বৎসরের মত অন্নচিন্তা করিতে হইবে না। সে রসিকের কথায় সামান্য থতমত খাইয়াছিল, একেবারে ঘাবড়াইয়া যায় নাই। সে রায় মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া আবার ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল, "তা নয়, তবে কিনা রায় মশাই বলেছিলেন, তাই সংবাদটা দিতে আস্‌তে হ'ল। মেয়েটী ভারী সুন্দরী, হাজারের মধ্যেও একটী মিলে কি না সন্দেহ,—মেয়েটী আমার বড়ই পছন্দ হয়েছে।"

রসিক চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, "মেয়েটী যদি পছন্দ

হয়ে থাকে, নিজেই না হয় বিয়ে করে ফেল, আর নিতান্ত যদি নিজের অসুবিধা হয়, তারিণীচরণকে গছাও গে যাও। যেখানে ঘটকালি হচ্ছে, সেইখানেই হক না, আবার এখানে কেন?"

গোবিন্দ ঘটকালি করিয়া খায়, রসিকের কথায় রাগ করিলে বা হাল ছাড়িলে তাহারতো আর ব্যবসাই চলিতে পারে না। সে রায় মহাশয়ের মুখের কথা না লইয়া কিছুতেই নড়িতে পারে না; তাই সে বুদ্ধিমানের মত রসিকের কথাটা সামান্য হাসিতে উড়াইয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে রায়মশাই কি স্থির করিলেন?"

রসিক এবার সত্যই বেজায় গরম হইয়া গেল। সে তাহার লাঠিটা ফরাশের উপর সজোরে আছড়াইয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্র ভাবে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দিকে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় রায় মহাশয়ের গলা হইতে একটা গম্ভীর আওয়াজ বাহির হইল, "গৌরীশঙ্কর রায় দুইবার স্থির করে না। সে যখন একবার স্থির কয়েছে যে তার নাতির সঙ্গে রতন বোসের মেয়ের বিয়ে দেবে, তখন সেই তার শেষ স্থির। যদি তা সম্ভব না হয়, তা হ'লে গৌরী শঙ্কর রায় জীবিত থাক্‌তে আর তার নাতির বিয়েই হবে না। তার মৃত্যুর পর তার নাতি ইচ্ছে কল্লে অন্যত্র বিয়ে কর্ত্তে পারে; কিন্তু যেনো তাও গৌরীশঙ্কর রায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

মালপূর্ণ দ্রুতগামী শকট সহসা সজোরে ধাক্কা খাইলে তাহার ভিতরের মালগুলা যেমন একবারে উলট পালট হইয়া যায়, সেইরূপ

রায় মহাশয়ের এই অপ্রত্যাশিত কথাগুলার ধাক্কা খাইয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সমস্ত আকাশ কুসুম যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গেল। রায় মহাশয়ের কথাটা তাহার কর্ণে তেলুগু ভাষার মত অবোধ্য ও বিকট ঠেকিল। সে মহা ভীত ভাবে রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বোসেদের বাড়ীর বিবাহটা একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আগামী সপ্তাহে পাকা দেখা। পাত্রের নিকট-আত্মীয় কেহ না থাকায় তাহার এক দুর সম্পর্কীয় মাতুল আগামী সপ্তাহে পুষ্পকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। বোসেদের বাড়ী বিবাহের আয়োজনটা প্রবল ভাবেই চলিতেছে। রতন বোসের একমাত্র কন্যা পুষ্পরাণীর বিবাহ—কাজেই কাণ্ডটা বৃহৎ। তাহার উপর তারিণী চরণ এবার রায়েদের দেখাইবার জন্য কাণ্ডটা একটু সুবৃহৎ করিবার মতলব করিয়াছে। বিবাহের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র অধিকাংশই খরিদ হইয়া গিয়াছে। বোসেদের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বিবাহের জিনিষ পত্রে আর পা ফেলিবার স্থান নাই।

এই অপব্যয়ের হিসাব পরিমাণ করিয়া খুড়ী একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি তারিণী চরণের মুখে বোধ হয় শতবার অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন। যাহাকে সম্মুখে পাইতেছিলেন, তাহারই সহিত একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিতেছিলেন। বকুনিরও বিরাম নাই, মুখেও বেদনা নাই। একের পর এক অবিরাম গতিতেই চলিতেছে। সমস্ত দিন একটা প্রবল লড়ায়ের পর সন্ধ্যার সময় খুড়ী

বোধ হয় একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই বোসেদের বিস্তৃত বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া একটু দম লইতেছিলেন ; সেই সময় পুষ্প আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। খুড়ীরূপ প্রদীপ মিট মিট করিতেছে দেখিয়া সে আবার উস্‌কাইয়া দিল। খুড়ীর নিকটে আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "চল ছোট দিদি, আজ তোমায় সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার করে আনি।"

কথা না কহিয়া খুড়ীর উদরটা ফুলিয়া উঠিতেছিল, তিনি পুষ্পকে পাইয়া আবার এক চোট আরম্ভ করিলেন, "আমার গায়ে আর সাবান মাখাতে হবে না। বলি হ্যালা পুষ্পি, তোর যে দেখি সকল কাজেই বাড়াবাড়ি। ঘড়ি ঘড়ি শুধু সাবানই মাখ্‌ছিস্, আর কাপড়ই ছাড়ছিস্,—বলি তোর হলো কি। বিয়ে কি আমাদের হয়নি, না তোরই এই নতুন হচ্ছে ?"

পুষ্পতে খুড়ীতে কথা হইলেই অমনি একটা না একটা লইয়া ঠোকাঠুকি বাধিয়া যাইত। খুড়ীর কথায় পুষ্প হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছোট দিদি, তবে না কি তুমি মিছে কথা কও না !"

খুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কি মিছে কথা কইলুম লা ! আজ কালকার মেয়েদের মত আমাদের অমন মিছে কথা কওয়া স্বভাব নয়। আমায় যে মিথ্যেবাদি কলঙ্ক দেবে, তার যে জীব খোসে যাবে।"

পুষ্প তাহার মুখখানা বেশ গম্ভীর করিয়া বলিল, "মিছে কথা কইলে না ! তোমার বুঝি আবার বিয়ে হয়েছিলো ?"

খুড়ী পঞ্চমে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বিয়ে হবে কেন ?

অমনিই এমন পোড়া কপাল পুড়েছে—মা! মেয়ের একটু সমিও নেই, যাকে যা নয়—তাই বলা।"

পুষ্প সেইভাবেই বলিল, "হুঁ! তোমার যে বিশ্রী চেহারা, তোমার নাকি আবার বিয়ে হয়।"

কানাকে কানা বলিলে তাহার ফল যে কি ভয়ানক দাঁড়াইতে পারে তাহা পুষ্পের কথায়ই বেশ প্রমাণ হইয়া গেল। পুষ্পের কথাগুলা শেষ হইতে না হইতেই খুড়ী একেবারে পাগলের মত ঝাপাইয়া উঠিলেন। মুখখানা একেবারে বিশ্রী বিকৃত করিয়া হাত দুইখানা পুষ্পের মুখের সম্মুখে নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্লি লা— !"

খুড়ীর ভঙ্গিমায় পুষ্প কিছুতেই হাসি দমন করিতে পারিল না, সে একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুষ্পের হাসিতে খুড়ী জ্ঞান হারাইলেন। আগুনের সহিত যেন বাতাস মিশিল। খুড়ী সেই বারান্দার উপর একেবারে রীতিমত নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিমণি, মা ঠাকরুণ উপরে আপনাকে একবার ডাক্‌ছেন?"

পুষ্প হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেল, এদিকে নিচে তখন কাঁদিবার পালা; কার্য্যেও তাহাই ঘটিল—খুড়ী একেবারে রীতিমত মড়া কান্না জুড়িয়া দিলেন।

বুড়ো শিবের মন্দির হইতে ফিরিয়া আশা পর্য্যন্ত কমলরাণীর মোটেই মনে সুখ ছিলনা। তিনি বুড়োর চরণে প্রাণের বোঝা নামাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বুড়ো যেন এবার ইচ্ছা করিয়াই

তাঁহাকে একেবারে রীতিমত জব্দ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার চিন্তার বোঝাটা তো খালি মোটেই হয় নাই, অধিকন্তু একটা গুরুভার তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া বোঝাটা ভারের গুরুত্বে একেবারে নাড়া চাড়ার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। এতদিন তিনি রায় মহাশয়ের পৌত্রিকে চক্ষে দেখেন নাই, কেবল লোক মুখেই শুনিয়াছিলেন যে রায় মহাশয়ের নাতিটি বিদ্যা-বুদ্ধিতে সত্যই হিংসার সামগ্রী; কিন্তু ভ্রাতার সেদিনকার কথাটায় তাঁহার সে ধারণাটা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন লোকেরা বাহির হইতেই কেবল বাহিরটা দেখিয়াই মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের যে মতামতের মূল্য কি ? কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা রীতিমত সন্ধান না লইয়া কখনই একটা অত বড় মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অখিলচন্দ্রকে দেখিয়া, তাহার সুস্থ সবল দেহের প্রতি চাহিয়া, তাঁহার ভ্রাতার কথাটা, তাঁহার প্রাণ আর বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না। সেই যে অখিলচন্দ্রের সঙ্কোচিত কম্পিত মস্তক সহসা তাঁহার পদপ্রান্তে নত হইয়া যে মাতৃত্বের দাবী করিয়া বসিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে আজ কমলরাণীর প্রাণ বিদীর্ণ হইবার মত হইতেছিল। সেই কথা স্মরণ হইবামাত্র নয়নে অশ্রু রাশি কেবলি উছলিয়া উঠিতেছিল।

মন্দির হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত এই কয়দিন ধরিয়া অনবরত চিন্তা করিয়াও কমলরাণী কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার একটুখানি চিন্তার উপর, সামান্য বিবেচনার উপর, একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। ভাবনার

একটু মাত্র উনিশ বিশ হইলেই কন্যার জীবন একেবারে মরুময় হইয়া ভিতরে ভিতরে পুড়িয়া চিরদিনের মত ছাই হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক, তিনি কেমন করিয়া এই গুরু দায়িত্বভার নিজের মস্তকে তুলিয়া লইতে পারেন ? যাহার ভার তিনিতো তাঁহাকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদিয়াছেন, এখন তিনি কেমন করিয়া এ দায়িত্ব হইতে উদ্ধার হইবেন। ভাবনার প্রবল উচ্ছ্বাসে তাঁহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "তোমার যে বড় আদরের পুষ্পের বিয়ে, তুমি আজ কোথায়! যার শক্তি নেই, তার উপরে কেন এ গুরু দায়িত্বভার চাপিয়ে গেলে ?"

অখিলচন্দ্রকে পুষ্পের বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কি না তাহা আগে জানিতে পারিলেও তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু নানা ভাবে কন্যাকে লক্ষ্য করিয়াও তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। বিবাহ একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আর না জানিলেও নয়, তাই তিনি আজ কন্যাকে স্পষ্ট সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

পুষ্প আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। কন্যার সরল সুন্দর মুখখানির উপর দৃষ্টি পড়ায় কমলরাণীর সমস্ত প্রাণটা যেন আবার উথলিয়া উঠিল। পতি পত্নীর মধুর প্রেম, মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া, যাহা হইতে ধরার গায়ে চির স্মৃতি অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহার মুখের দিকে চাহিলে পুরান দিনের কত কথা

জাগিয়া উঠে। কমলরাণী কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিলেন। পুষ্প কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া মায়ের মুখখানি আজ বড় মলিন লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া মায়ের সম্মুখে বসিল,—দুই হস্তে জননীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অতি কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ মা ?"

কন্যার কথার উত্তরে কমলরাণী কেমলমাত্র বলিলেন, "কি ভাববো আবার ?"

পুষ্প মৃদুস্বরে বলিল, "তবে মা তোমার মুখখানি এত চুন কেন ?"

কমলরাণী মৃদু হাসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার মলিন-মুখের মলিন হাসি আরও বিষাদ হইয়া গেল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোর বিয়ে হবে. তুই শ্বশুর বাড়ী চলে যাবি,—তোকে ফেলে একলা কি করে থাকবো—তাই ভাবছি।"

পুষ্প মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন মা, আমারতো শ্বশুড়বাড়ী যেতে হবে না। ছোট দিদি যে বল্‌লে, আমার শ্বশুরের বাড়ী ঘর কিছুই নেই।"

কন্যার কথায় কমলরাণীর প্রাণটা যেন বিদীর্ণ হইবার মত হইল,—তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "শ্বশুর বাড়ী নেই কি রে ? শ্বশুরবাড়ী আছে বই কি, তবে সে তেমন ভাল নয়। তা হক,—তবু সে যে তোর শ্বশুর বাড়ী,—শ্রীক্ষেত্রের চেয়েও পুণ্যক্ষেত্র—কাশীর চেয়েও পবিত্র। একবারও কি আর সেখানে যাবি নি ?"

জননীর নয়নে অশ্রু দেখিয়া পুষ্পের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কেন যাব না মা, তুমি যেখানে পাঠাবে, সেইখানেই যাবো।"

কমলরাণী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে পুষ্প, রায় মহাশয়ের নাতির সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় তো কেমন হয়?"

সহসা আজ জননীর মুখে এই কথাটা শুনিয়া পুষ্প একেবারে সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। তাহার সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া গেল। সে তাহার জননীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে অবনত মস্তকে অঞ্চলাস্থিত চাবিগুলি নাড়িতে লাগিল। কমলরাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোর মা, আমার কাছে আবার তোর লজ্জা কিসের রে? বল্ না, ভাল হয়—না?"

পুষ্প জননীর মুখপানে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, তাহ'লে যে মা, মামাবাবু এখন অভ্রমে পড়বেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রায়েদের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজ কয়েকদিন ধরিয়া নানাদিক দিয়া নানাভাবে চিন্তা করিয়াও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী রায় মহাশয়ের কথাগুলার কোন অর্থই নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। এক পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে, বিবাহের জিনিসপত্র খরিদের আর বিশেষ কিছু বাকী নাই। তথাপি গৌরীশঙ্কর রায়ের মুখে এ কি কথা! "আমি যখন রতন বোসের কন্যাকে রায়েদের কুলবধূ করিব স্থির করিয়াছি, তখন তাহাই আমার শেষ স্থির।" এ বেয়াড়া স্থিরের অর্থ কি? কিন্তু কালু সর্দ্দারের বিকট চেহারাটা তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠায় তাহার যেন ভিতরটা একেবারে শুকাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয়ের কথাগুলার অর্থ যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। সে চির ভীত, নিরীহ ব্রাহ্মণ, ঘটকালি করিয়া খায়, ফৌজদারীর মাঝে যাইতে একেবারেই নারাজ! পেটের অপেক্ষা প্রাণের মূল্যটা যে অনেক অধিক বেশী, তাহা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও একেবারেই ভুলিতে পারে নাই। অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, এখন আর ফিরিবার উপায় নাই, অনেক দিনের সাধ তাহার পূর্ণ হওয়ায় যে উৎসাহ, যে আনন্দ লইয়া সে বোসেদের বিবাহটায় নামিয়াছিল, গৌরীশঙ্কর রায়ের

কথাটা শুনিবার পর হইতে তাহার সে আনন্দ, সে উৎসাহ একে-বারে নিবিয়া গিয়াছে। আজ দুই দিন হইল সে আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতার গোলযোগের ভিতর পড়িয়া সে অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গ্রামে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গৌরাশঙ্কর রায়ের কথাগুলা তাহার মনের ভিতর উঁকি মারিতে লাগিল। সে যখন পাকা দেখার পাকা খবরটা লইয়া বোসেদের বাড়ী উপস্থিত হইল, তখন তাহার মনের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়।

বোসেদের বৈঠকখানা গৃহে কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরি-বেষ্টিত হইয়া তারিণীচরণ ধূমপান করিতেছিলেন। পণ্ডিতগণের সকলের হস্তেই এক একটা থেলো হুকা। সকলেরই নাক মুখ হইতে চাপ চাপ ধূম বাহির হইয়া সমস্ত গৃহটা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বোধ হয়, তথায় বিবাহের লগ্নের সময়টা নিরূপণ করা হইতেছিল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তারিণীচরণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি এত-ক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলেম! আশীর্ব্বাদের দিনটা একেবারে পাকা করে এসেছ তো?"

চক্রবর্ত্তীর মনে সুখ না থাকিলেও অভ্যাসমত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, চক্রবর্ত্তী যে কাজে হাত দেয়, তা কি আর পাকা না হয়ে যায়। পাত্রের মাতুল আগামী রবিবারেই আসছেন।

চক্রবর্ত্তী নীরব হইলে তারিণীচরণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কে আসবে, কিছু খবর পেলে?"

চক্রবর্ত্তী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এমন বিশেষ কেউ আস্‌বে না। পাত্রের মাতুল, আর তার দুই চারিজন বন্ধু। সব শুদ্ধ বড় জোর দশ বারজন হবে।"

তারিণীচরণ এতক্ষণে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইল। আজ কয়েকদিন হইতেই সে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর একটা।'মিউনো মিউনো' ভাব লক্ষ্য করিতে-ছিল। কারণ জানিবার জন্য প্রত্যহই সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবে—কিন্তু নানা কাজের গোলযোগে পড়িয়া সময়মত আর সে কথাটা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আজিও গোবিন্দ চক্র-বর্ত্তীর মুখের সেই ভাবটা লক্ষ্য করিবামাত্র সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "চক্রবর্ত্তী, আজ ক'দিন থেকে তোমায় এমন 'মিউনো মিউনো' দেখ্‌ছি কেন? অসুখ বিসুখ কিছু ক'রেছে নাকি?"

তখন চক্রবর্ত্তী একজন ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে একটা থেলো হুকা দখল করিয়া প্রবল টানে ধোঁয়া বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল। তারিণীচরণের প্রশ্নে সে হুকাটায় একটা 'সুখ টান' দিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "অসুখ বিসুখ এমন কিছু নয়;—তবে সেদিন রায় মহাশয়ের মুখে একটা বড় বেফাস্‌—"

তারিণীচরণ মহা ব্যস্তভাবে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম! রায় মহাশয়ের কিছু গোলমাল করবার মতলব আছে না কি?"

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "কথাটার অর্থ ঠিক

বুঝতে না পারলেও,—ওই রকমই যেন একটা কিছু মনে হয়।"

একটা কেবলমাত্র 'হুঁ' বলিয়া আবার তারিণীচরণ গুড়গুড়ীর নলটা টানিতে লাগিল। তাহার মুখখানা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা বেগে চড়া পর্দ্দায় বলিয়া উঠিল, তা হ'লে আমিও কিন্তু সোজায় ছাড়ছিনি চক্রবর্ত্তী। একবার যদি কোনক্রমে জানতে পারি, রায় মহাশয়ের মতলব খারাপ, তা'হলে আমি এমন ব্যবস্থা করবো, যে তার আদুরে নাতিকে আর ছ মাস পত্তি কর্ত্তে হবে না।"

এক ফৌজদারীর ভয়েই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভিতরটা শুকাইয়া উঠিয়াছিল—আবার ফৌজদারী! গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পেশা ঘটকালি,—মিলনের রাগিণী শোনাই তাহার অভ্যাস, এ দামামা তাহার সহ্য হইবে কেন? বিবাহের উপর আর তাহার মোটেই আস্থা রহিল না। চক্ষের সম্মুখে যেন তাহার সমস্তই অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। তারিণীচরণের মুখেও কথা নাই, সে গম্ভীরভাবে সেই বিষয়টাই চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় তথায় কালি ভড়ের আবির্ভাব হইল। কালি ভড়কে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া তারিণীচরণ আর একবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে কালি ভড়কে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "আসুন ভড় মশাই, আপনাদের যে আর দেখাই নেই। অত বড় একটা কাজ—কোথায় দেখবেন শুনবেন, করবেন করযাবেন—তা মোটে দেখাই নেই।"

কালি ভড় একেবারে আসিয়া তারিণীচরণের সম্মুখে বসিল। তাহার পর বেশ একটু এদিক ওদিক চাহিয়া জুত করিয়া লইয়া আরম্ভ করিল,—"আমাকে আর অত করে বল্‌তে হবে কেন বাবাজী! রতনের মেয়ের বিয়ে, এতো আমার ঘরের কথা। করবো কর্‌যাবো তা কি আর বল্‌তে হবে। নানা ঝঞ্ঝাটে—বুঝলে কিনা, আসি আসি করেও আসা আর কিছুতেই ঘটে উঠে না। কালও আসবো বলে আসা আর হ'লো না। রায় মহাশয়ের ক্রমাগত ডাকাডাকি,—ভাবলুম একবার, না—আর গিয়ে কাজ নেই, তারপর ভাবলুম, কি জানো বাবাজী—একবার ভাবখানাই দেখে যাওয়া যাক্ না! বুড়ো কি বল্লে জানো,—যে তোমরা তো বোসেদের সর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছ,—বলি বিয়েটা হবে তো। কথাটা শুনে আর রাগ সাম্‌লাতে পারলুম না,—তুমি বড় লোক আছ, তা নিজের ঘরেই আছ, আমাদের বোসেরাও কারুর চেয়ে খাটো নয়। স্পষ্টই মুখের উপর বলে ফেল্‌তে হ'লো, তবে কি না একবার ভাল করে চোখ মেলে দেখনা, এমন আয়োজন জীবনে কখনও দেখনি।"

কালি ভড়ের কথায় তারিণীচরণ অহঙ্কারে যেন অনেকটা স্ফীত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাঁকিল, "ওরে কে আছিস্, ভড় মশাইকে তামাক দিয়ে যা।"

দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত কালি ভড় একেবারে ফড় ফড় করিয়া অনেকগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া পার্শ্বস্থিত বৈঠকের উপর হইতে একটা শূদ্রের হুকা তুলিয়া লইয়া একজন ব্রাহ্মণের হুকা হইতে একটা কলিকা ছিনাইয়া লইয়া টানিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পণ্ডিতগণ-পরিত্যক্ত দগ্ধ কলিকা, তাহার তামাকু বহু পূর্ব্বেই গুলে পরিণত হইয়াছিল ; সে তাহাতে কয়েকটা জোর জোর বৃথা টান দিয়া, সহসা আবার বলিয়া উঠিল, "বুঝলে চক্রবর্ত্তী। তারপর আমার এই কথা না শুনে—কি বল্লে জান হে চক্রবর্ত্তী ! আস্পর্দ্ধার কথাটা একবার শোন,—বলে কি না বিয়ের আসর থেকে ক'নে টেনে নিয়ে আস্‌বে ! 'হাতি ঘোড়া গেল তল—ব্যাঙ বলে কি না কত জল'। কথাটা শুনে আর হাসিটা চেপে রাখ্‌তে পারলুম না। বুঝলে কি না বাবাজী, মুখের ওপরেই হেসে ফেল্‌তে হ'লো।"

রায় মহাশয়ের সেদিনকার কথাটা শুনিয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সেইরূপই একটা কিছু ঘটিবার আশঙ্কা করিতেছিল। কালিভড়ের কথায় তাহার ধারণাটা একেবারে মোক্ষম হইয়া গেল, সে অতি মৃদু গলায় বলিল, "ব্যাপারটা ক্রমেই বড় গোলমাল হ'য়ে দাঁড়াল ! রায় মহাশয়ের কথাটা শুনে পর্য্যন্ত, আমারও যেন সেই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা হচ্ছিল।"

কালি ভড়ের গলাটা যেন লাফাইয়া উঠিল, "বলিহারী যাই তোমার আশঙ্কায় ! আমরা উপস্থিত থাকতে আসর থেকে কনে' তুলে নিয়ে যায়, এমন বান্দা তো দেখ্‌তে পাইনি হে। আবার মজাটা দেখ, গৌরীশঙ্করের চেয়েও ওই রসুকে ছোড়ার আস্ফালনটা কিছু বেশী। বলে কি জানো বাবাজী, যে সম্বন্ধীর সম্বন্ধটা এবার লাঠির মুখে বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ছোড়ার কথা শুনে আর হেসে বাঁচিনি।"

কথাটা বলিয়া কালি ভড় যেন একটা অবজ্ঞার ভঙ্গিমায় হো

হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির ধমকে তাহার একেবারে দুই-পাটী দাঁতই বাহির হইয়া পড়িল। 'সম্বন্ধীর সম্বন্ধটা' যেন তারিণী-চরণের আঁতে যাইয়া ঘা দিল। সে কালি ভড়ের কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল,—"তাহ'লে ভড়মশাই আমার আর দোষ নেই। 'সম্বন্ধীর সম্বন্ধটা' দেখছি বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।"

ক্রমেই সম্প্রদানের স্থানটা অনেকখানি নিকাইবার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভিতরটা একেবারে শুকাইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "শুভ-কাজে ও সব হাঙ্গাম-টাঙ্গাম যত না হয়, ততই মঙ্গল।"

কালি ভড় একটা বিশ্রী রকম হাসিয়া বলিল, "আরে রাম বল, এর আবার হাঙ্গাম টাঙ্গাম কি হে। বুড়োটার কি আর পদার্থ আছে? নাতিটীকে ধরে এনে, দুটী কান ধরে দু'গালে দুটী চড় দিয়ে ছেড়ে দিলেই, ও ফড়ফড়ানি আর থাকবে না।"

তারিণীচরণ সজোরে তাহার দুই হস্তে একটা তালি দিয়া বেশ একটু উচ্চৈস্বরে বলিয়া ফেলিল, "ঠিক বলেছেন ভড়মশাই, কালই আমি সেই বন্দোবস্ত করছি।"

অস্থানে মুক্তা ছড়ান হয় নাই দেখিয়া ভড়মশাই মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল। কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস নাই, তাই সে ব্যাপারটা একটু টেঁকসই" করিবার জন্য আর একটা কোটীন চড়াইবার চেষ্টায় ছিল, সেই সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "মামাবাবু, মাঠাকুরুণ আপনাকে একবার বাড়ীর ভিতর ডাকছেন, বিশেষ কি দরকার আছে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরীশঙ্কর রায় যে কোন দিন মিত্র ছিলেন, তাহা রামজীবন-পুরের অন্যান্য লোক কেন, তাঁহার অতি নিকট আত্মীয়রাও বিস্মৃত হইয়াছিল। নবাবী আমলের খেতাপ রায়টা যেন মিত্রকে একেবারে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার সিংহাসন রীতিমত দখল করিয়া লইয়াছিল। মিত্রের স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া খেতাপ রায়ই যেন এক্ষণে গৌরীশঙ্করের পদবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে ভুলিলেও এ কথাটা কমলরাণী ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার না ভুলিবার একটা বিশেষ কারণ ছিল,—সেই কারণটাই এক্ষণে বলিব।

গৌরীশঙ্কর রায় কমলরাণীর সহিত অখিলচন্দ্রের পিতার বিবাহই স্থির করিয়াছিলেন,—এমন কি দুই পক্ষেই আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একটুখানি কথার মারপ্যাঁচে সামান্য মাত্র উনিশ বিশ হওয়ায় তিনি রায়েদের কুলবধূ না হইয়া বোসেদের গৃহে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

অনিন্দ্যসুন্দরী কমলরাণীর মূর্ত্তি দেখিয়াই রায় মহাশয় অতি সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্তের গৃহেও পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বিবাহের সমস্তই স্থির,—সহসা গৌরীশঙ্কর রায় কমলরাণীর পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার

কন্যাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া আসিয়া বিবাহ দিতে হইবে। তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া বিবাহ দিতে তাঁহার বাটী উপস্থিত হইবেন না! অবস্থা মন্দ হইলেও কমলরাণীর পিতার মর্য্যাদা জ্ঞান কাহারও অপেক্ষা খাটো ছিল না,—তিনি রায় মহাশয়ের এই অসঙ্গত প্রস্তাবে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন,—ফলে বিবাহ বন্ধ হইল। মহা জেদী গৌরীশঙ্কর রায় সেইদিনই অন্যত্র পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং যথাসময়ে সেইখানেই অখিলচন্দ্রের পিতার বিবাহ হইয়া গেল।

এই কন্যাটীর উপর বোসেদেরও অনেকদিন হইতে নজর পড়িয়াছিল। তাহারা এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিল না, বরং যেন গৌরীশঙ্কর রায়কে দেখাইবার জন্যই মহা আড়ম্বরে বিবিধ ঘটা করিয়া কমলরাণীকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিল;—নির্দ্ধারিত দিনে রতন বোসের সহিত কমলরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। বিধি নির্ব্বন্ধে কমলরাণী রায়েদের কুলবধূ হইতে হইতেই, বোসেদের গৃহলক্ষ্মী হইলেন।

সেই পুরান কথাটা আজ সহসা কমলরাণীর মনে পড়ায় তিনি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যে সম্পূর্ণ মনুষ্যহস্তের বহির্ভাগে, তাহা তাঁহার নিজের ঘটনা স্মরণ হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখানে মনুষ্যের ইচ্ছা বা চেষ্টার যে কোন মূল্যই নাই, তাহা তিনি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছিলেন। যাহা সম্পূর্ণই ভগবানের হস্তে ন্যস্ত, তাহার জন্য বৃথা চিন্তায় কোন ফল নাই জানিয়া আজ কমলরাণী তাঁহার অস্থির

চিত্তকে অনেকটা সুস্থির করিতে পারিয়াছেন। আজ আর চিন্তা-রাক্ষসী বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নয়নের সম্মুখে কেবলি ভীতিপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করিতে অক্ষম হইয়া লজ্জায় সঙ্কোচিত ভাবে দূরে দূরে,—বহু দূরে, ক্রমেই দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার হৃদয় শুভ্র নির্ম্মল উষার মত ধীরে ধীরে বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল।

কয়েকদিন হইতে বৃষ্টি নাই, তাহার উপর হাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলেই ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। প্রথম শ্রাবণে বিশ্ব প্রকৃতি একটা স্তব্ধ গুমোট ভাব ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। অসীম সুনীল আকাশ তারার মালা পরিয়া যেন মহাগর্ব্বে একেবারে প্রশান্ত—স্থির। নিশ্চয়ই কৃষ্ণপক্ষের রজনী—আকাশে তখনও চাঁদের উদয় হয় নাই। রজনীর কৃষ্ণবসন আশেপাশে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন বিশ্ব-জগৎ ধীরে ধীরে ঢাকিয়া দিতেছিল। বোসেদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার সুবিস্তৃত ছাদের উপর একখানি শীতল পাটীতে অর্দ্ধশায়িত হইয়া কমলরাণী বিধিনির্ব্বন্ধের কথাই ভাবিতেছিলেন,—আর ক্ষুদ্র মনুষ্যের সেই বিরাট পুরুষের অলঙ্ঘনীয় লেখনার উপর লেখনী চালাইবার প্রাণপাত চেষ্টা দেখিয়া মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই বিশ্বনিয়ন্তার শক্তির পরিচয় পাইয়াও কেন যে মানুষ অনর্থক হাকপাক করিয়া মরে, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেই সময় পুষ্প আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে তাহার

জননীর মস্তকের নিকট বসিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তুমি যে এমন অন্ধকারে একলাটী চুপ করে বসে আছ। তোমার কি হয়েছে মা?"

কন্যার কথায় কমলরাণী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন "কি হবে আবার?"

বহুদিন পরে জননীর মুখে হাসি দেখিয়া পুষ্পের আজ বড় আনন্দ হইল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবু ভালো যে তুমি আজ হাসছ? আচ্ছা মা, তুমি অমন মাঝে মাঝে মুখখানি ভারি করে, কি করে থাক? আমি কিন্তু মা একটুখানিও না হেসে থাকতে পারিনি। আমায় মা, কেমন করে মুখভার করে থাক্‌তে হয়, শিখিয়ে দাও না।"

কমলরাণী কন্যাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "বালাই! ষাট্! তুই কি দুঃখে মুখ ভারি কর্ত্তে শিখবি। তোর মুখে যেন ঐ হাসি চিরদিন ফুটে থাকে, ভগবান করুন তোর যেন না কখনও মুখ ভার কর্ত্তে হয়?"

জননী কন্যাকে আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে তাহার মুখখানি তুলিয়া চুম্বন করিলেন। পুষ্প জননীর নিবিড় স্নেহের পবিত্র-স্পর্শ দেহের প্রতি শিরায় অনুভব করিল। কমলরাণী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁরে পুষ্প, বিয়ের পর তুই আমাকে ভুলে যাবিনিতো?"

জননীর কথায় পুষ্পের চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল, সে

যেন একটু ভারিক্কের মত বলিল, "হাঁ তা বই কি? মাকে বুঝি কেউ আবার ভোলে?"

পুষ্পের কথায় কমলরাণীর প্রাণটা যেন আজ ভরিয়া গেল। যে লতার বক্ষে পুষ্প মুকুল হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া যখন বায়ু হিল্লোলে সুরভী ছড়াইয়া বিশ্ব জগৎ আকুল করিয়া তোলে, তখন লতা যে আনন্দ,যে গর্ব্ব অনুভব করে, তাহা লতাই কেবল অনুভব করিতে পারে, সে আনন্দ বা সে গর্ব্বের ভিতর প্রবেশ করিবার শক্তি বা অধিকার অন্যের নাই। কমলরাণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "এত দিন তুই আমার ছিলি; এইবার তুই অন্যের হবি। দু দিন বাদে তোর বিয়ে হবে, তুই কন্যা ছিলি—এইবার বধূ হবি। এত দিন তোর বাপের বাড়ীতে মায়ের স্নেহে, বাপের আদরে দায়িত্ব-হীন অবস্থায় কন্যা জীবন কেটে গেছে. এইবার তুই মহা দায়িত্বপূর্ণ বধূজীবনে পা দিতে চলেছিস্; এইবার স্ত্রীলোকের মহাগর্ব্বের সামগ্রী কুলবধূর আসন গ্রহণ করবি। স্নেহে, ভক্তিতে, ভালবাসায় সরলতায় দেখিস্ যেন আমাদের মুখ রক্ষা করিস। বাপের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের কিছুরই বিকাশ হয় না, মনে থাকে যেন শ্বশুরবাড়ী-তেই স্ত্রীলোকের পূর্ণ বিকাশ!"

কমলরাণীর কথাটা কম্পিত হইল, তিনি নীরব হইলেন। পুষ্প এতক্ষণ নীরবে জননীর মুখের পানে চাহিয়া মায়ের কথাগুলি শুনিতেছিল। জননীকে নীরব হইতে দেখিয়া সে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, মেয়ে মানুষের শ্বশুরবাড়ীই তাহ'লে সব চেয়ে বড়—না?"

কন্যার কথার উত্তরে কমলরাণী অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "স্বামীর ঘর, শ্বশুরবাড়ী তার চেয়ে আর স্ত্রীলোকের বড় কি আছে! পৃথিবীতে স্বামীই যে স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ। পতি পূজায়, পতি ভক্তিতে সাবিত্রী যমকেও পরাজিত করেছিলেন। তাই আজ সাবিত্রীর পূজা ঘরে ঘরে। তুইও সতী সাবিত্রীর মত হয়ে তোর মা বাপের, শ্বশুর শাশুড়ীর মুখোজ্জ্বল কর্ত্তে পারবি তো?"

পুষ্প কোন উত্তর দিল না, সে অবনত মস্তকে কেবল মাত্র একটুখানি ঘাড় নাড়িল। উন্মুক্ত ছাদের বক্ষে, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র মণ্ডলীর নাচে জননী ও কন্যার এই পবিত্র বাণীগুলি চারিদিকে তাহার মাধুর্য্য ছড়াইয়া যেন স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করিল। দূরে পূর্ব্ব কোণে চন্দ্রোদয় হইল,—চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে রজনীর কৃষ্ণ অন্ধকার বিগলিত হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষীণ অথচ মধুর হাসি পুষ্পের মুখখানিতে পড়িয়া এক অপরূপ ভাতি ফুটাইয়া তুলিল। কন্যার মুখের পানে চাহিয়া উচ্ছ্বলিত স্নেহে কমলরাণীর সর্ব্বশরীর পুলকিত এবং দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। তাঁহার গত জীবনের সমস্ত ইতিহাস নিমিষে চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত হইয়া পড়িল। মনে পড়িল পুষ্পের সেই জন্মদিনের আনন্দ উৎসব, দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর গত হইবার পর, যখন বোসেদের বাড়ীর সকলেই বধূর আর সন্তান হইল না বলিয়া একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা পুষ্পের ভাবি আগমন বার্ত্তা সমস্ত পুরী আনন্দে মুখোরিত করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পুত্র হইবে

কি কন্যা হইবে এই আনন্দ-তর্কে পতি পত্নীতে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছিল ; তাহার পর ভয় ভাবনার আন্দোলনের মাঝে পুষ্পের জন্ম হইল। সেই পুরাণ দিনের সব কথা আজ একে একে, পরে পরে আসিয়া কমলরাণীর চক্ষের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মাতাকে বহুক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া পুষ্পের ক্ষুদ্র প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল, কিন্তু মাতার সহিত সে এক্ষণে যে কি কথা কহিবে তাহাও খুঁজিয়া পাইল না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "মা একটা গল্প বল না।"

কন্যার স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় কমলরাণীর চমক ভাঙ্গিল, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এখন আর গল্পে কাজ নেই,—রাত হয়েছে, খাবি চল।"

কমলরাণী উঠিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার আর উঠা হইল না। তারিণীচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অতি মিহিস্বরে ভগ্নীর নিকট আসিয়া বলিল, "কমল! তুমি কি আমায় ডাক্‌ছিলে?"

কমলরাণী গম্ভীরভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "হাঁ দাদা। পুষ্পকে কবে তাঁরা আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসবেন, তার কি দিন স্থির হয়েছে?"

তারিণীচরণ ভগ্নীর সম্মুখে বসিতে বসিতে বলিল, "হা, আমি সেইজন্যই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতায় পাঠিয়ে ছিলেম। সে সব ঠিক করে আজ ফিরেছে। এই সম্মুখের রবিবার তাঁরা পুষ্পিকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসবেন।"

কমলরাণী অতি কমলস্বরে বলিলেন, "দাদা বিয়ের ত আর দিন নেই,—বন্দোবস্তের আর কিছু বাকি নেই তো। আমার এক-মাত্র মেয়ে পুষ্প, তার বিয়েতে যেন সাধ আহ্লাদ কিছু কম না হয়।"

ভগ্নীর কথায় তারিণীচরণ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা আর বল্‌তে হবে কেন বোন! পুষ্পির বিয়ে, যতদূর সম্ভব ধুমধাম করবার সমস্ত বন্দোবস্তই করেছি। তবে আজ একটা বড় বিশ্রী সংবাদ পেলেম,—"

কমলরাণী উৎকণ্ঠিত ভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দুর্ব্বল মন একটুতেই বিচলিত হইয়া পড়ে। ভ্রাতার কথায় তাঁহার প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। তারিণীচরণ বলিতে লাগিল, "তাতে আমি ভয় করি না, তবে কিনা একটা শুভ কাজে দাঙ্গা হাঙ্গামা—"

কমলরাণী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "দাঙ্গা হাঙ্গামা—সে কি দাদা?"

তারিণীচরণ যেন একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "রায় মশাই নাকি বলেছেন, বিয়ের আসর থেকে ক'নে জোর করে টেনে নিয়ে যাবেন। তাই ভাবছি টেনে নিয়ে যাওয়াটা যে কি জিনিষ, সেটা আগেই তাঁকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেব।"

কমলরাণী তাড়াতাড়ী ভ্রাতাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "গায়ে পড়ে রায় মশায়ের সঙ্গে বিবাদ কর্ব্বে। ছি ছি! এমন কাজ কখনও করো না। দাদা, যে তোমায় এ কথা বলেছে, যেন নিশ্চয়ই এ তার

নিজের মনগড়া কথা। রায় মশায়ের মুখ দিয়ে এ কথা বেরিয়েছে এ আমি তাঁর মুখ থেকে নিজের কানে শুনলেও বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে। দাদা তুমি রায় মশাইকে জান না; তাঁর মন এত নীচ নয় যে তিনি এই হীন কাজে প্রশ্রয় দেবেন। যাঁকে ভগবান শক্তি দিয়েছেন, তাঁকে সে শক্তির ব্যবহারেরও ক্ষমতা দিয়েছেন। সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা।"

ভগ্নীর কথাগুলা তারিণীচরণের মোটেই ভালো ঠেকিল না, কিন্তু কমলরাণীর কথার উপর কথা কহিবার সাহস তাহার কোন দিনই ছিল না। কাজেই ভগ্নীর নিষেধটায় সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিতে পারিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল গৌরীশঙ্কর রায় একেবারেই বাটী হইতে বাহির হন নাই;—এমন কি নিজের কাছারি বাড়ীতেও উপস্থিত হইতেন না। তিনি বড় সখ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌত্রকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইবেন বলিয়া একখানি অতি সুন্দর ভিক্টোরিয়া ফিটন সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন কিন্তু তিন চারি দিনের অধিক তাহাতে আর আরোহণ করা হয় নাই। এই একমাস কাল তিনি তাঁহার চিন্তা লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে বেড়াইতে বাহির হওয়াতো দূরের কথা লোকের সহিত কথা কহিতে পর্য্যন্ত তাঁহার বিরক্ত বোধ হইতেছিল। চিন্তাটার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আর লোকের সম্মুখে বাহির হইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আজ আর বাহির না হইলে নয়,—প্রতি মাসের এই দিনে তিনি একবার করিয়া তাঁহার পত্নীর সমাধি-মন্দিরে যাইতেন,—বৈকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তিন চারি ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই কাজটা আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নিয়মমত চলিয়া আসিতেছে—ত্রিশ বৎসরের ভিতর একদিনও কামাই ছিল না। এত

চিন্তার ভিতরও রায় মহাশয় সেইটী কেবল বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বৈকাল হইতে না হইতেই তিনি ভৃত্যকে গাড়ী জুতিয়া আনিবার জন্য আস্তাবল বাটীতে প্রেরণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া গেটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। যথাসময়ে রায় মহাশয় পত্নীর সমাধি-মন্দিরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পত্নীর মৃত্যুর পর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গৌরীশঙ্কর রায় নদীর একেবারে গর্ভের ভিতর, যেস্থানে তাঁহার পত্নীর শবদেহ দাহ হইয়াছিল তথায় এক সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতরে স্ফটিক প্রস্তরের এক মহাদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই নির্জ্জন নদীতীরে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষের ক্ষুদ্র উদ্যানে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দিরটী যেন একটা শান্তিকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। এই সমাধি-মন্দিরের তত্ত্বাবধানের জন্য রায় মহাশয়ের মাসে মাসে কিছু নিয়মিত ব্যয় হইত। ক্ষুদ্র উদ্যানটী সজীব রাখিবার জন্য দুইজন মালি নিযুক্ত ছিল এবং মন্দিরের ঠাকুরের পূজার জন্য একজন পুরোহিত রীতিমত মাসিক বেতন পাইত।

রায় মহাশয় যখন যাইয়া সমাধি-মন্দিরে পৌঁছিলেন তখনও সূর্য্য-অস্তের অনেক বিলম্ব ছিল, কিন্তু আকাশের পশ্চিম কোণে একখণ্ড কাল মেঘ জমাট হইয়া সূর্য্যকে একেবারেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর রায় সমাধি-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রে যাইয়া মন্দিরের দেবতার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন,—তাহার পর নদীর দিকে

প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটের উপর যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। এইখানে আসিলেই তাঁহার প্রাণটাকে একেবারে উদাস করিয়া দিত,—প্রাণের ভিতর কোনই ভাবনা চিন্তা থাকিত না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, এ কথা সে কথা চিন্তার মধ্যে আজও তাঁহার প্রাণটা উদাস হইয়া গিয়াছিল। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তাঁহার আত্মা অন্তর্জগতের ভিতর বিচরণ করিতেছিল, তাহার মাঝে কখন সেই পশ্চিম কোণের কাল মেঘখানা ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত আকাশ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সহসা উৰ্দ্ধে নিম্নে,—দূরে নিকটে,—দৃশ্যে অদৃশ্যে একটা গাঢ় উন্মত্ততা,—অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের বাহন উচ্চ-শৃঙ্গ মহিষটারমত মাথা ঝাঁকা দিয়া উঠিয়া চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া একেবারে সচেতন করিয়া দিল। রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিলেন,—প্রবল ঝড় উঠিয়াছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে—তিনি সত্বর তথা হইতে উঠিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এই ব্যাত্যা-বিতাড়িত আকাশের দিকে চাহিয়া গৌরীশঙ্কর রায়ের ভিতরটা যেন দুলিতে লাগিল ;—তাহা ভয়ে কি আনন্দে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাঁহার ভিতরের চিন্তাটা এই প্রলয়ের মধ্যেও যেন একটা বাধাহীন শক্তি—বন্ধনহীন স্বাধীনতা লইয়া গৌরীশঙ্কর রায়ের হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত তেজকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ রায় মহাশয়ের হৃদয়কে একেবারে বিচলিত করিয়া ফেলিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ !

তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জ্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা গৌরীশঙ্কর রায়ের হৃদয়াবেগেরই মত অব্যক্ত? না একটা সত্য অঙ্গীকারকে, অন্ধকারের জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঊষার আলোকের মত পরিষ্কার করিবার জন্যই, আকাশ বাতাসে এই মাতামাতি,—এই রোষ-গর্জ্জিত ক্রন্দন। পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল "জাগো জাগো" বলিয়া গৌরীশঙ্কর রায়ের কর্ণের পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা প্রবল প্রচণ্ড উদ্দীপনা!—কিসের উদ্দীপনা? তাহা স্পষ্ট পরিষ্কার না হইলেও,—চারিদিক হইতে কেবল রব উঠিয়াছে জাগো! জাগো! জাগো!

সহসা সেই ঝড়-বৃষ্টি ভেদ করিয়া একটী বালিকা আসিয়া সেই মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল,—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিয়াছিল। বায়ু-প্রবাহে ওলট পালট খাইয়া সে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার দমবন্ধ হইবার মত হইয়াছিল, সে একটু দম লইয়া বিশেষ বিরক্ত ভাবে সেই বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এখন কি করে বাড়ী যাবে বল দেখি? অত করে বল্লুম যে চল দিদিমণি, মেঘ করেছে বাড়ী ফিরে যাই,—কোন কথা তো কানে তোল না, ওই তোমার দোষ?"

বাতাসের সেই মাতামাতি—বিশ্বের এই ওলট পালট ভাব দেখিয়া বালিকা যেন একটা আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, সে দাসীর বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এইটুকু ছুটিয়া আসিতে,—চোখে মুখে বালি ঢুকিয়া পরিচারিকাকে

একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছিল,—সে বালিকার হাসিতে বিশেষ বিরক্ত হইয়া ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখস্থ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত রকের উপর বসিয়া পড়িল। সে প্রকাশ্য ভাবে আর কোন কথা না বলিয়া রাগে মনে মনে বিড়বিড় করিতে লাগিল। বালিকা এতক্ষণ পথের দিকে চাহিয়াছিল, এক্ষণে নদীর দিকে ফিরিল। ফিরিবামাত্র মন্দিরের একপার্শ্বে উপবিষ্ট রায় মহাশয়কে দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে রায় মহাশয়ের নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও বুঝি আমাদের মত ঝড় বৃষ্টি দেখে এখানে এসে ঢুকেছ! তোমার বাড়ী কি এই গাঁয়েই। বুড়ো মানুষ—এই ঝড়-বৃষ্টিতে কেমন ক'রে বাড়ী যাবে ?"

বালিকার মন্দিরে প্রবেশ হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত রায় মহাশয় নীরবে এই অপরূপ বালিকার মধুর চঞ্চলতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। বালিকা যে সহসা তাঁহাকে এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিবে তাহা তিনি মোটেই ধারণা করিতে পারেন নাই, সহসা বালিকার প্রশ্নে তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন,—কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্য। তিনি বালিকার প্রশ্নে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার বাড়ী এই কাছেই। তোমার বাড়ী কোথা ?"

বালিকা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "আমার বাড়ীও এই কাছেই,—এখান থেকে এক ছুটে বাড়ী পৌঁছান যায়।"

বালিকার অপরূপ সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার সরল

কথাগুলি শুনিয়া রায় মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রাণটা সহসা গলিয়া যেন স্নেহরসে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বালিকা আসিয়া তাঁহার অতি সন্নিকটেই বসিয়াছিল, তিনি স্নেহকম্পিত স্বরে বালিকাকে আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

রায় মহাশয়ের প্রশ্নে মেঘে ঢাকা চাঁদের ক্ষীণ জোছনার মত মধুর হাসি বালিকার সমস্ত মুখখানিতে ভাসিয়া উঠিল ;—সে রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম পুষ্প ! আমার বাবার নাম ৺রতন চন্দ্র বসু। তুমি এই গাঁয়ে থাক, তাঁর নাম শোননি ?"

বালিকার কথায় গৌরীশঙ্কর একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণের অন্ধকারের ভিতর যাহা এতক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, এক্ষণে যেন তাহার চারিপার্শ্বে উজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহা একেবারে স্পষ্ট ধ্রুব সত্য হইয়া গেল। বালিকার সাজ সজ্জা ও সঙ্গে পরিচারিকা দেখিয়াই রায় মহাশয় যাহা ধারণা করিয়াছিলেন, সেটা সত্য কিনা তাহাই জানিবার চেষ্টায় বালিকার নামটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু বালিকা একেবারে তাহার পিতার নাম বলিয়া সেই সন্দেহটার এমনই সোজা মীমাংসা করিয়া দিল যে গৌরীশঙ্কর রায়কে কিছুক্ষণের জন্য হতভম্বের ন্যায় বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইল। পুষ্প বৃদ্ধের এই বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিল—বুঝি সে তাহার পিতার নাম অবগত নয় বলিয়াই এমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তা তুমি আমার বাবার নাম শোননি, তাতে আর হয়েছে

কি ? তুমি বুড়ো মানুষ, তুমিতো আর গাঁয়ের সব খবর রাখ না, তুমি কি করে শুনবে বলনা ?"

বালিকা তাঁহার বিস্মিতভাব লক্ষ্য করিয়াছে দেখিয়া রায় মহাশয় সত্বর তাঁহার সে ভাব দমন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা নয়, আমি তোমার বাবার নাম শুনেছি। তুমি অত বড় জমিদারের মেয়ে হয়ে এমনি হেটে বেড়াও, তাই ভেবে আমি অবাক হয়ে গেছিলুম।"

বালিকা মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল, "কেন তাতে দোষ কি ? আমাদের গাঁয়ের রায়েরা তো আমাদের চেয়েও কত বড় জমিদার। রায় মহাশয়ের নাতিও তো হেঁটে বেড়ায় ?"

বালিকার গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া, তাহার এই সুন্দর সরল কথাগুলি শুনিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি রায় মহাশয়ের নাতিকে দেখেছ নাকি ?"

পুষ্প হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ দেখিনি ? এই দেখনা, আমি তাকে একটা মাছ ধরে দিয়ে এই আংটীটা বাজীতে জিতে নিয়েছি।"

বালিকা তাহার হস্তস্থিত অখিলচন্দ্রের আংটীটা রায় মহাশয়কে দেখাইল। রায় মহাশয় প্রথম হইতেই বালিকার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন,—সেই মুখখানি দেখিয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছিল না, নতুবা বালিকার অঙ্গুলিস্থিত অখিলচন্দ্রের অঙ্গুরীয়টা এতক্ষণ তাঁহার লক্ষ্য করা উচিত ছিল। বালিকার মুখখানি দেখিয়া পর্য্যন্ত একটা চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের পুরাণ কথা তাহার মনে জাগিয়া

উঠায় তিনি একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। আজ পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একখানি ক্ষুদ্র মুখ তিনি এমনিভাবেই দেখিয়াছিলেন। জননীর সমস্ত রূপ লইয়া,—সে তাঁহার বধূমাতা হইবার জন্য,—রায়েদের কুলবধূর আসন গ্রহণ করিতে আকুল আগ্রহে হাত বাড়াইয়াছিল, কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বতেজ রক্তের অন্ধগর্ব্বে জননীকে দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। আজ সেই কথাটা মনে পড়ায় একটা তীব্র অনুশোচনায় বৃদ্ধের প্রাণের ভিতরটা যেন ধিক্কার দিয়া উঠিল। একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস হৃদয়ে তুমুল ঝড় তুলিয়া বাহিরে বাহির হইয়া আসিল। বালিকার কথায় তিনি আর উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না,—নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তার কালো ছায়ায় তাঁহার সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পুষ্প বৃদ্ধের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি কি ভাবছ! কেমন করে বাড়ী যাবে! তার জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি তোমায় লোক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

রায় মহাশয় এবার মৃদু হাসিলেন;—"বলিলেন, আমি বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু এখনও চোখে দেখতে পাই। চল্লিশ বৎসর বয়সে একবার চখে চাল্‌সে ধরেছিল বটে, কিন্তু এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। একবার ভুল করেছি, কিন্তু আর ভুল কর্‌বো না।"

পুষ্প মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি রাস্তা ভুলে এখানে এসে পড়েছ? তাহ'লে এখন কি করে রাস্তা চিন্‌তে পার্‌বে? আবার ভুল কর্‌বে না তো?"

গৌরীশঙ্কর রায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় বোসেদের গাড়ী আসিয়া সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। পুষ্প পরিচারিকার সহিত বেড়াইতে বাহির হইবার অল্পক্ষণ পরেই দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। ঝড়-বৃষ্টিতে কন্যা ফিরিল না দেখিয়া কমলরাণীর গাড়ী তাহার অন্বেষণে চারিদিকে ছুটিয়াছিল। যেখানে যেখানে থাকা সম্ভব, তাহার সমস্তই অন্বেষণ করিয়া শেষে তাহারা সমাধি-মন্দিরটা দেখিতে আসিয়াছিল। পুষ্প তাহাদের গাড়ী দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। ঝড় বৃষ্টিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য ক্রমেই তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া পড়িতেছিল,—সেই সময় মন্দিরের সম্মুখে সে তাহাদের গাড়ী দাঁড়াইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। সে হাসিতে হাসিতে রায় মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওই আমাদের গাড়ী এসেছে,—চল আমাদের সঙ্গে, আমি তোমায় গাড়ী ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দেব এখন। বুড়ো মানুষ ঝড় বৃষ্টিতে শেষে রাস্তায় পড়ে মারা যাবে।"

পুষ্পের কথায় রায় মহাশয় মৃদু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সেই সময় রতন বোসের পুরাতন ভৃত্য নফরচন্দ্র একটা হ্যারিকান লণ্ঠন লইয়া মহা সোরগোল করিয়া পুষ্পের অনুসন্ধানে মন্দিরের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ রায় মহাশয়ের সম্মুখে পুষ্পরাণীকে দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হ্যারিক্যান লণ্ঠনটা এক পার্শ্বে নামাইয়া, রায় মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া করযোড়ে একটা নমস্কার

করিয়া বলিল, "হুজুরের গাড়ী কি এখনও এসে পৌঁছায়নি! গাড়ীর জন্য কি হুজুরের বাড়ীতে খবর দিতে হবে?"

রায় মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না,—তোমরা তোমাদের দিদিমণিকে নিয়ে যাও। আমার গাড়ী এলো বলে।"

তখন ঝড় একেবারেই থামিয়া গিয়াছিল,—বৃষ্টিও অনেকটা ধরিয়া আসিয়াছিল। ছাতায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, জীর্ণ ভগ্ন লণ্ঠন হস্তে—সেই সময় মন্দিরের পুরোহিত তাঁহার নৃত্য বেগার সারিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তিনি রায় মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া একটু জড়সড় হইয়া বলিলেন, "রায় মশাই যে! কখন এলেন? ঝড় বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।"

নফরের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়াই পুষ্পের সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে পুরোহিতের মুখে 'রায় মহাশয়' শুনিয়া সে যেন কেমন সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। সে একবার মাত্র বঙ্কিম-দৃষ্টিতে রায় মহাশয়ের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিল। রায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য তাহার ব্যাকুল ইচ্ছাসত্ত্বেও একটা মহা সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে আর এক পদও অগ্রসর হইতে দিল না। সে অবনত মস্তকে চুপ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময় চারিদিকে আগমনবার্ত্তা প্রচারিত করিয়া দূরে রায় মহাশয়ের জুড়ীর গম গম শব্দ ধ্বনিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে যখন সমস্ত বিল, পুকুর, ডোবা জল অভাবে শুষ্ক হইয়া উঠে, তখন সেই জলনিবাসী অধিবাসিগণ যেমন পাকের মধ্যে পড়িয়া একটুখানি জলের আশায় ক্রমেই নিরাশ হইয়া কোন মতে শীর্ণভাবে কেবলিই খাবি খাইয়া থাকে—অখিল চন্দ্রও সেইরূপ তারিণীচরণের প্রচণ্ড তৎপরতায় পুষ্পের আশায় একেবারে হতাশ হইয়া ক্রমেই ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া উঠিতেছিলেন। একদিন ছিল—যখন অখিলচন্দ্রের বিশেষ কিছুরই প্রয়োজন ছিল না,—সম্মুখে একটা যাহা কিছু পাইলেই তাহাতেই মহা উৎসাহে,—অসীম আনন্দে মাতিয়া যাইতে পারিতেন ;—অতি অল্প আয়াসেই তাঁহার মন তাহার ভিতর নিবিষ্ট হইয়া পড়িত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মনে একটা কি ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, যাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছে। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি না হইলে তাঁহার যেন জীবনধারণই একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বকার অভ্যাস মত একটা যাহা তাহা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মনটাকে নিবিষ্ট করিবার জন্য এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ণপরিচয়ের ছাত্রের এম, এ, পাশ করার মত তাহা এক্ষণে

এমনি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় যে সে চেষ্টা হইতে বিরত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর কিছুতেই স্থির হইতে পারেন না।

এতদিন অখিলচন্দ্রের ভিতর যে যৌবন সুপ্ত ছিল,—যাহার কথা পূর্ব্বে কখনও কোন দিন তিনি চিন্তা পর্য্যন্ত করেন নাই, তাহাই আজ যেন পুষ্পরাণীর সোণার কাটীর মোহময়-স্পর্শে একেবারে গা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দশরথের শব্দভেদী বাণের মত তাহা যেন আজ কেবল একটা শব্দের অনুসরণ করিয়া সমস্ত বিশ্ব সংসার ঘাটিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুধিত প্রাণীর সহিত অখিলচন্দ্রের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না,—সহসা ইহার আলাপ তাঁহার নিকট এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে তিনি কেবল তাহাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত,—অন্য চিন্তার বা অন্য ভাবনার তাঁহার মোটেই আর অবসর নাই।

শ্রাবণের আকাশের কোলে কাল মেঘ নাচিয়া নাচিয়া নানা ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চলা চপলার অপরূপ অপূর্ব্ব আলিঙ্গনে তাহারা যেন আরও জমাট কালো হইয়া নিবিড় ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ঝুপ ঝাপ বৃষ্টির কল-সঙ্গীত সমস্ত বিশ্বকে মুখোরিত করিয়া তুলিতেছে। অখিলচন্দ্র নিরাশার চিন্তায় হৃদয়টাকে ধুপের মত জ্বালাইয়া দিয়া উপরে তাঁহার শয়নকক্ষের বারান্দার উপর একখানা আরাম কেদারায় নীরবে পড়িয়াছিলেন। বৈকালের পর গোধুলী,—গোধুলীর পর সন্ধ্যা, একে একে বিদায় হইয়া রাত্রি যে বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা তাঁহার মোটেই খেয়াল ছিল না। সহসা

এই শেষ বরষার বিদায় সমারোহের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার হৃদয়দ্বার যেন উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। আকাশের এই কৃষ্ণ অন্ধকার ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কে যেন বর্ষাকাশ হইতে বিদীর্ণ মেঘচ্ছুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া একমাত্র তাঁহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্তি কাতরতা প্রসারিত করিয়া দিল।

পূর্ব্বে যে জীবনটা অখিলচন্দ্রের,সুখে সন্তোষে কাটিয়া গিয়াছে, আজ সেই জীবনটাকেই তিনি মহা ভারি বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা.—কত পূর্ণিমার রাত্রি—কত ভাবে কতদিন আসিয়াছিল কিন্তু তাঁহার শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্র হস্তে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সেই দুর্লভ শুভক্ষণে কত সঙ্গীত কত ভাবে অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে, কে তাহার নির্ণয় করিবে। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল স্থল আকাশের কেন্দ্র-কুহর হইতে যে এমন রাগিণীতে এমন বাঁশী বাজিতে পারে তাহা চিরান্ধ অখিলচন্দ্র পূর্ব্বে কখনও অনুমান করিতে পারেন নাই। যে পুষ্পের সুন্দর কোমল কর-স্পর্শ এক মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্য্যালোকে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে, তাহার পাওয়ার আশা তিনি কেমন করিয়া ছাড়িতে পারেন? তাঁহার দৃষ্টি,—তাঁহার আকাঙ্ক্ষা,—তাঁহার বাসনা আজ যেন একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া কেবল একটীর জন্য আকুল উচ্ছ্বাসে ছুটিয়াছে। তাই থাকিয়া থাকিয়া ঘন নিশ্বাসে তাঁহার দেহের সমস্ত রক্তস্রোত তোলপাড় হইয়া

উঠিতেছে। কেমন যেন একটা কিসের সুকোমল মধুর স্পর্শে,—ফুলের মত অপূর্ব্ব পুলকে তাঁহার সমস্ত হৃদয়টাকে বেষ্টন করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বপ্ন-জাগরণের মধ্য দিয়া অখিলচন্দ্রের এই নিরানন্দ সময়টা কাটিয়া যাইতেছিল, সহসা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাদামহাশয়। তাঁহার নয়ন ভরা স্নেহ দৃষ্টি আকুল আগ্রহে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে আজ একটা আশা নিরাশার প্রবল স্পন্দন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

গৌরীশঙ্কর রায় তাঁহার পৌত্রের বিবাহ সম্বন্ধে যে জটিল চিন্তা-জালে জড়িভূত হইয়া এতদিন সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিলেন, আজ সমাধি-মন্দিরে এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কি করিবেন আর কি করিবেন না, সেই প্রবল ঝড়ের মধ্যে আজ তিনি তাহা একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন; বিশ্ব প্রকৃতি যখন প্রলয়ের বেশে সজ্জিত হইয়া আকাশে বাতাসে মাতামাতি করিতেছিল, তখন একখানি ক্ষুদ্র মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি বাটী ফিরিয়াই পৌত্রের সন্ধানে উপরে আসিয়াছিলেন। উপরে আসিয়া কক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দার উপর একখানা আরাম কেদারায় শায়িত, চক্ষু মুদ্রিত পৌত্রের ম্লান মুখখানির প্রতি চাহিয়া তাঁহার স্ববীর প্রাণের সমস্ত স্নেহ যেন হৃদয়ের উৎস খুলিয়া উথলিয়া উঠিল।

যখন তাঁহার জগতের নিবিড় স্নেহ বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া

যাইতেছিল, তখন এই একটিমাত্র স্নেহধারা আবার ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদযে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল,—যখন সমস্ত আলো নিবিয়া যাওয়ায় তিনি অন্ধকারে কেবল হাতড়াইয়া মরিতেছিলেন, তখন এই একটিমাত্র আলো প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছিল। তাহাকে তাঁহার অদেয় সংসারে কি থাকিতে পারে? তাহার জন্য তিনি না পারেন কি?

দাদা মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া অখিলচন্দ্র তাঁহার চিন্তা-স্রোতের মুখে তাড়াতাড়ি একটা বিস্মৃতির বাঁধ বসাইয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন। দাদা মহাশয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দাদা মশায় কখন ফিরলে? আমি ভাবছিলুম বুঝি তুমি আর আজকে ফিরবে না। ঝড় বৃষ্টিতে ঠাকুমার পাশেই রাত কাটাবে!"

একটা পুরাণ স্মৃতির সজোর আঘাতে বৃদ্ধের হাড় কখানা যেন একবার নড়িয়া উঠিল। তিনি অখিলচন্দ্রের পরিত্যক্ত আরাম কেদারায় বসিতে বসিতে বলিলেন, "ভায়া, আমি তো তোমার ঠাকুমার পাশে অনেক রাতই কাটিয়েছি, তার জন্যে তো দুঃখ নেই, দুঃখ এই তুমি যার পাশে রাত কাটাবে তাকে তোমার পাশে দিয়ে যেতে পারলুম না।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বৃদ্ধের নাসিকাপথে বাহির হইয়া আসিল, বৃদ্ধ নীরব হইলেন। অখিলচন্দ্র গৃহের ভিতর হইতে একখানা

চৌকি টানিয়া আনিয়া ঠিক দাদা মহাশয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তাহার পর তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ যে তোমার অন্যায় দুঃখ দাদা মশায়! তুমি যখন হিন্দু—নিশ্চয়ই ভগবান মানো। ভগবান যখন আমার অদৃষ্টে বিয়ে লেখেনি, তখন তোমার এ দুঃখুর মানে ভগবানকে গালাগালি দেওয়া।"

গৌরীশঙ্কর রায়ের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "ভগবান যে তোমার অদৃষ্টে বিয়ে লেখেনি, এটা যে ধ্রুব সত্য তার তো এখনও কোন অকাটা প্রমাণ ভায়া দেখতে পাচ্ছিনি।"

অখিলচন্দ্র নিজেকে বেশ একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছ না! না দেখবার তো কোন কারণই নেই। তা যদি না হবে দাদা মশায়, তাহ'লে এমন চারদিকে বেয়াড়া গোলমাল হবার অর্থ কি? দাদা মশায় নিয়তি—নিয়তি! নিয়তির কাজটাই যে অদ্ভুত দাদা মশায়! সে এমনভাবে তার চক্রটা ঘোরায় যে মানুষের কেন, স্বয়ং বিধাতারও বুঝবার ক্ষমতা নেই যে সেটা কোন্ দিকে ঘুরছে?"

রায় মহাশয়ের বসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ভৃত্য সটকায় কলিকা বসাইয়া সম্মুখে আনিয়া রাখিয়া ছিল। এতক্ষণ সে সটকাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাখার সাহায্যে হাওয়ায় আগুনটা জমাইতেছিল। আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে সটকার নলটা রায় মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রায় মহাশয় সটকার নলটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সেটা কোন্ দিকে ঘুরছে

তাতো বল্‌লে বিধাতারও বোঝবার ক্ষমতা নেই   তবে ভায়া তুমি কি করে বুঝলে ?"

কাঁচা সাক্ষীর মতন অখিলচন্দ্রকে জেরায় হারান সহজ নহে। কাজে লাগুক্ আর নাই লাগুক্ তিনি যখন সুখ্যাতির সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি জেরায় হটিবেন কেন। অখিলচন্দ্র বেশ একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝলেম কি করে দাদা মশায়! সেটা যে তুমিই বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেছ।"

পৌত্রের কথায় গৌরীশঙ্কর রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার নাতির বিবাহ হইবে না, তিনিই বুঝাইয়া দিয়াছেন? কি সর্ব্বনাশ! সে কি! তিনি বিস্মিতের ন্যায় পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বুঝিয়ে দিয়েছি! সে কি রকম? কবে—কখন?"

অখিলচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দাদামশায়, তোমার যখন ইচ্ছে, রতন বোসের মেয়েকেই রায়েদের কুলবধূ কর্ব্বে, অন্য পাত্রীর সঙ্গে নাতির বিয়ে দেবে না, অথচ বোসেদের মেয়ের সঙ্গে অন্য পাত্রের বিয়ে আস্‌ছে সপ্তায়—তখনিই তো কথাটার একেবারে পরিষ্কার মীমাংসা হয়ে গেছে। আরও কি বুঝিয়ে বল্‌তে হবে?"

এতক্ষণে গৌরীশঙ্কর রায় কথাটার গভীরতা উপলব্ধি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের ভিতরটা একবারে কাঁপিয়া উঠিল। সটকার নলটা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল,—তাঁহার

গলাটা কম্পিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ব। অমত তাতে তোমার বিয়ে হবে না, এমন কিছু মানে নেই। তোমার নিজের ইচ্ছায় তুমি যেখানে সেখানে বিয়ে কর্ত্তে পার। তুমি বিয়ে করবে তাতে বাধা দেবার আমার কোন শক্তি নেই।"

দাদামহাশয়ের কথায় যেন একটা উত্তেজনা অখিলচন্দ্রের মুখে চোখে ছড়াইয়া পড়িল ;—তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার শক্তি নেই। দাদামশায় আমার এখনও মাথা খারাপ হয়নি। যে মায়ের মত স্নেহে ছেলেবেলায় আমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—কিশোরে যাঁর বাপের মত সুশাসনে আমি সুশিক্ষিত হয়েছি—যৌবনে যে আমায় বন্ধুর মত বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছে ; তাঁর অমতে যদি আমি ঈশ্বরের নামও মুখে আনি, তাতেও যে আমার পাপ হবে। দাদামশায় অখিলচন্দ্র রায় এত হীন নয়,—সে গৌরীশঙ্কর রায়ের নাতি বলতে নিজেকে গর্ব্ব অনুভব করে।"

পৌত্রের কথায় বৃদ্ধের প্রাণের ভিতরটা যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ;—একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে অশ্রু আসিয়া তাঁহার নয়ন দুটী ভরিয়া দিল, তিনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—••০◊০••—

রাত্রি তখন বোধ করি দশটা বাজিয়া গিয়াছে;—আকাশে মেঘ ঘনঘটা করিয়া বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। রজনী ঘোর অন্ধকার। সেই স্তব্ধ বিরাট অন্ধকারকে আলোড়িত করিয়া বোসেদের বৈঠকখানায় কয়েকজন লোকের চাপা গলার আওয়াজ শ্রুত হইতেছিল। শীঘ্রই একটা দুর্য্যোগের সম্ভাবনা দেখিয়া সকলেই যে যাহার গৃহের দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়াছে। এই স্তব্ধ বিরাট অন্ধকার রাত্রি একেবারে নীরব নিস্তব্ধ শুধু মাঝে মাঝে দূরে আকাশ প্রান্তে মেঘের গুর গুর আওয়াজ হইতেছে। বোসেদের বৈঠকখানায় আলোক অতি স্তিমিত-ভাবে জ্বলিতেছে,—ফরাশের উপর তারিণীচরণ ও কালি ভড় উপবিষ্ট; তাহাদের সম্মুখে মেজের উপর কয়েকজন ভীষণাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে। কালি ভড় চাপা গলায় বলিতেছিল, "তোরা অমন অবুজ হস্ কেন? রাণীমা না বল্লে, মামাবাবুর কি দায় পড়েছে যে এত বড় কথাটা বলে। মামাবাবুর মেয়েকেতো আর তুলে নিয়ে যাবে না,—যাবে তোদেরই সাত পুরুষের জমিদারের মেয়েকে। এত বড় অপমানটা তোরা চোখ বুঝে সহ্য করবি?"

মেজের উপর দুড়কায় যে কয়জন লোক বসিয়াছিল তাহাদের ভিতর যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে ভড়ের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার দুইটা চোখ বাঘের মত জ্বলিতেছিল। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "হুজুর যদি অন্য কারো কথা হতো, তাহ'লে ওই মামাবাবুর হুকুমেই এতক্ষণ তার মাথাটা ফাঁক করে দিয়ে আসতুম। কিন্তু রায় মশাই যে কি তার হুস্‌টা রেখেছেন কি? রাণীমার নিজের মুখের হুকুম না শুন্‌লে এ কাজে আমরা হাত দিতে পারি না।"

কালি ভড় আর রাগ সামলাইতে পারিল না। দুই ঘণ্টাকাল নানা ভজং লাগাইয়াও সে এই বাগ্‌দী কয়টাকে কিছুতেই জুত করিয়া আনিতে পারিতেছিল না। সে তাহাদের কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল, "রাণীমার মুখের হুকুম পেলেই কি রায় মশায়ের বল কমে যাবে, না তোদের আর দুটো ক'রে হাত বেরুবে?"

যে লোকটা এইমাত্র কথা কহিয়াছিল সে অতি কর্কশকণ্ঠে বলিল, "রায় মশায়ের জোরও কমবে না, দুটো হাতও বেরুবে না তা জানি হুজুর। কিন্তু রাণীমা মুখ ফুটে হুকুম দিলে এ রকম দু দশটা প্রাণ আমরা অনায়াসেই দিতে পারি।"

ভড় বিকৃত মুখে তারিণীচরণের দিকে চাহিল, সে যেন একটু বিরক্তভাবে কহিল, "তুমি একবার ভালো করে মণ্ডলের পোদের বুঝিয়ে বল যে হুকুমটা কার! বাবাজী তুমি যে একেবারে চুপ করে রইলে।"

ভগ্নীর নিষেধ সত্ত্বেও তারিণীচরণ স্থির থাকিতে পারে নাই।

কমলরাণীর অজানিতভাবে গৌরীশঙ্কর রায়ের নাতিকে কাছারি বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়া রীতিমত অপমানিত করিয়া ছাড়িয়া দিবার আয়োজন করিতেছিল। ভগ্নীর সেদিনকার কথায় তাহার যেন কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছিল যে, রায় মহাশয়ের একটা কথাতেই এখনও কমলরাণী নুইয়া পড়িতে পারেন। রীতিমত একটা বিবাদ রায়েদের সহিত না বাধাইতে পারিলে এখনও সম্পূর্ণ ভরসা নাই। তাই সে প্রথম হইতেই বিবাদটা পাকাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নানা দিক দিয়া নানাভাবে খোঁচা মারিয়াও কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সেই সময় কালি ভড়ের অধিষ্ঠান হওয়ায় সে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। এতদিন তাহার বুদ্ধিতে যাহা আসে নাই, কালি ভড়ের চক্র পাশে পাশে ঘোরায় তাহার যেন বুদ্ধি খুলিয়া গেল; সে একেবারে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সে স্থির করিয়াছিল যে কালি ভড়ের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে আর দেখিতে হইবে না। তখন যা বিবাদ বাধিবে তাহা ঠাণ্ডা হইতে দু এক পুরুষের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সে তাহার নির্দ্ধারিত পাত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ সারিয়া লইতে পারিবে।

বোসেদের কয়েক ঘর বাগ্‌দী প্রজা ছিল, তাহাদের পেষাই ছিল খুন ডাকাতি। বোসেরা তাহাদের নিকট খাজনা লইতেন না, বংশপরম্পরায় তাহারা বিনা খাজনায় বোসেদের জমি ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে; তাহার কারণ জমিদারী শাসন করিতে হইলে দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায় ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ কোন একটা

কিছু বাধিলেই ইহারা বাপ ব্যাটায় লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং বোসেদের জন্য দুই দশটা প্রাণ দিতেও কাতর হইত না। কালি ভড়ের পরামর্শে তারিণীচরণ সেই বাগ্‌দীদিগের সর্দ্দার গৌর মণ্ডলকে ডাকিয়া পাঠাইল। জমিদার বাটীর তলব পাইয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য গৌর মণ্ডল তাহার দল বল লইয়া সন্ধ্যার পরই বোসেদের বৈঠকখানায় হাজির হইয়াছিল। কিন্তু সেই সন্ধ্যা হইতে এই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তারিণীচরণ ও কালি ভড় উভয়ে মিলিয়া নানাভাবে বুঝাইয়াও কার্য্যটা সমাধা করিতে তাহাদের কিছুতেই রাজী করাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহারা কার্য্যটা সমাধা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু এক-বেয়াড়া জেদ ধরিয়াছে, "রাণীমার মুখের হুকুম চাই!"

এ কার্য্যে রাণীমার মুখের হুকুম পাওয়া তো দূরের কথা বরং জানিতে পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা তাহা তারিণীচরণ বিলক্ষণ জানিত। সে নানাভাবে বলিয়াও ইহাদের রাজী করিতে না পারায় একেবারে হতাশভাবে নীরব হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু কালি ভড় তখনও আশা ছাড়ে নাই, সে কথাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তখনও দেখিতেছিল। সহসা কালি ভড়ের স্বরটা তারিণীচরণের কর্ণে যাওয়ায় সে গৌর মণ্ডলকে সম্বোধন করিয়া আবার আরম্ভ করিল, "বলি তোরা হলি কি, বলতো? রাণীমার মুখের কথা না হ'লে তোদের দ্বারা আর কোনও কাজ হবে না? রাণীমা কি তোদের সম্মুখে খাড়া হয়ে হুকুম দেবেন। ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শোন না।"

গৌর মণ্ডল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা হুজুর তুমি গালাগালি দাও আর যাই কর, রাণীমার হুকুম ভিন্ন আমরা পারবো না।"

তারিণীচরণ ধমক দিয়া কহিল, "পারবিনি কেন?"

গৌর মণ্ডল এবার চেঁচাইয়া কহিল, "কি কও মামা বাবু, এ কি সোজা কাজ! রায় মশায়ের কোপে পড়লে কি আর গাঁয়ে বাস করতে পারবো।"

ভড় দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিল, "আরে কোপে পড়বি কি করে? পেছন থেকে ধাঁ করে একখানা কাপড় ফেলে দিয়ে, একেবারে মুখ বেঁধে ফেলবি। চোখে কি আর দেখতে পাবে?"

গৌর মৃদু হাসিয়া বলিল, "হুজুর এ সব কাজ কি আর ঢাকা থাকে?" ওঠ্‌রে মানকে, চ ঘরকে যাই। হুজুর কসুর নিয়ো না, মোরা এ কাজ করতি পারবো না।"

তাহাদের উভয়ের অনুনয়, বিনয়, ভৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া গৌর মণ্ডল যখন তাহাদের দল বল লইয়া উঠিবার উপক্রম করিল, তখন তারিণীচরণ ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চক্ষে অগ্নি বর্ষণ করিয়া মনে মনে অগণ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল, কিন্তু কালি ভড় শেষ একবার চাঁদীর আওয়াজ শুনাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সে তারিণীচরণের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবাজী গৌরের না বলবার কারণ আছে। এত বড় কাজটা যদি ওরা হাসিল করে দেয় তাহ'লে বকসিস্‌টা কি রকম মোটা গোছের হবে সেটা তো বাবাজী একবারও বলনি। এতে তো অভিমান ওদের হতেই পারে!"

তারিণীচরণ কালি ভড়ের কথাটা শেষ হইবামাত্র উত্তেজিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বকসিস্! ওরা যদি কাজ হাসিল করে দিতে পারে, আমি ওদের হাজার টাকা বকসিস্ দেব। যদি আমার কথায় ওদের বিশ্বাস না হয়, টাকা না হয় ওরা আগাম নিক।"

গৌর তাহার মাথাটা নাড়িয়া এক হস্ত প্রমাণ জিহ্বাটা বাহির করিয়া ফেলিল। সে তারিণীচরণেব কথাটার মাঝখানেই কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। বৈঠকখানা হইতে ভিতরে অন্তঃপুরে প্রবেশের যে দ্বারটা ছিল তাহা সহসা খুলিয়া গেল, দ্বারের সম্মুখে কমলরাণী,—তাঁহার পশ্চাতে একজন পরিচারিকা। সুস্পষ্ট তীব্রকণ্ঠে কমলরাণী ডাকি-লেন, "দাদা!"

অকস্মাৎ সেই মুহূর্ত্তে বৈঠকখানাস্থিত সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া কমলরাণীর মুখের উপর গিয়া পড়িল! তারিণী-চরণের সমস্ত কাজের উপরেই যে কমলরাণীর তীব্র দৃষ্টি সতত সংবদ্ধ থাকিত, তাহা তারিণীচরণের ধারণা করিবারই ক্ষমতা ছিল না। আজকের কাণ্ডটারও যথাসময়ে তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাই দুঃখে ঘৃণায় একেবারে উত্তেজিত হইয়া ভ্রাতার কাণ্ড দেখি-বার জন্য বৈঠকখানার কপাটের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ভ্রাতার সমস্ত কথাবার্ত্তাই শুনিতে-ছিলেন, বোধ করি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মাথার উপর অঞ্চল ছিল কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। তারিণী

চরণ পাংশুমুখে কেমন যেন এক রকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল দ্বারের সম্মুখে তাহার ভগ্নী স্বয়ং কমলরাণী। সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবামাত্র কমলরাণী তৎক্ষণাৎ দ্বারের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। দ্বারের আড়াল হইতে সুস্পষ্ট তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, তোমার এ কি মতলব ?"

মানুষ যাহা ধারণা করে না, তাহাই যদি সম্ভব হয়, দরিদ্র কেরাণী সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়াই দরজায় যদি ছোট আদালতের পেয়াদা দেখিতে পায়, তাহার যেমন অবস্থা হয় কমলরাণীকে সহসা একেবারে বৈঠকখানার দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া তারিণীচরণের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। যে কথার আর উত্তর নাই, সে কথার সে কি উত্তর দিবে ? ভয়ে ঘৃণায় সে একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না, সে মহা অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে গৃহের চারিপার্শ্বে চাহিতে লাগিল। গৌর মণ্ডল কথা কহিল, সে দ্বারের নিকট একটু অগ্রসর হইয়া মাথাটা মাটীতে ঠেকাইয়া একটা গড় করিয়া বলিল, মা ঠাকুরুণ আমরা বড়ই বিপদে পড়েছিলুম। মামা বাবু বলছিলেন, এটা না কি আপনারই হুকুম। তা আপনার হুকুম হ'লে আমরা বাঘের মুখেও যেতে পারি। তাই এতক্ষণ কি কর্ব্বো কিছুই মোরা ঠিক কত্তে পারছিলুম না। ভগবান মুখ রেখেছেন। একটু পায়ের ধূলো দেন, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাই।"

কমলরাণী পুনরায় তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা! আমি যে আমার স্বামীর সমস্ত মান মর্য্যাদা বিষয় সম্পত্তির ভার তোমার

উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। একবারও কি মনে হয় না তুমি কার ছেলে! ছি ছি! তোমার এমন মতলব।"

ব্যাপারটায় কালি ভড়ের মত লোকও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এতক্ষণে সে একটু নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একেবারে দাঁত বাহির করিয়া ফেলিল, বলিল, "বোস গিন্নি, আমিও সেই কথাই তারিণীচরণকে বলছিলেম, যে বাবাজী, রায় মশায় যদি বলেই থাকে, তাতে আর হয়েছে কি, সে তো আর তোমাদের মেয়ে এখনও টেনে নিয়ে যায়নি। এ সব কি তোমার ছেলে মানুষি মতলব।"

কালি ভড়ের কথাগুলা কিন্তু কোনই কাজে লাগিল না। যাঁহার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হইয়াছিল তিনি বহুক্ষণ পূর্ব্বেই অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্যা ও জননী উভয়েরই নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু মুক্তার ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। অতীত স্মৃতির তীব্র আঘাতে আজ আর অশ্রু কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। উত্তাপ পাইয়া হিমগিরির তুষার গলিতে আরম্ভ হইয়াছে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব। আজ শুভক্ষণে কন্যার মঙ্গলার্থে কমলরাণী স্থির করিয়াছিলেন কিছুতেই অশ্রু ফেলিবেন না; কিন্তু অশ্রু অবাধ্য হইয়াছে সে তাঁহার কোন নিষেধই মানিতে চায় না। আজ থাকিয়া থাকিয়া একজনের কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের ভিতর উদয় হইয়া তথায় অশ্রু-সমুদ্র সৃজন করিতেছিল, তাহা যে আজ এক বিন্দু ফাঁক পাইয়া বাহির হইয়া আসিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মায়ের অশ্রু সংক্রামক হইয়া কন্যার নয়নেও অশ্রু ঝরিতেছিল। কাহারও মুখে কথা নাই, কেবলই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

তখন দিবস ও সন্ধ্যার মাঝে দাঁড়াইয়া বিচিত্র বরণে বিচিত্রতা ছড়াইয়া বিশ্বের উপর সোনার গোধূলী নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। দুরে আসে পাশে ঝোপের ভিতর সন্ধ্যা-সাজে সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যারাণী লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে বাতাসে আনন্দ, আজ আনন্দের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। জুঁয়ের গন্ধ

অঙ্গে মাখিয়া পাগ্‌লা বাতাস কেবলই আসিয়া কক্ষের ভিতর আনন্দে যেন লুটাইয়া পড়িতেছিল। আনন্দের রাণী আনন্দে মাতিয়া আজ আনন্দের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। আজ পুষ্পের আশীর্ব্বাদ, তাই গোধূলীর সন্ধ্যা, প্রেমের আলিঙ্গনে মেশামেশি হইয়া যেন প্রেমের মাধুরী বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

চুল বাঁধা, সাবান মাখা, গা ধোয়া পরে পরে শেষ হইয়াছে। কমলরাণী এক্ষণে কন্যার মুখখানি তুলিয়া যত্ন ও নৈপুণ্যে ক'নে চন্দন পরাইতেছিলেন। দুইবার তিনবার বহুবার চন্দন পরান হইয়াছে কিন্তু কিছুতেই চন্দন থাকিতেছিল না,—অশ্রু প্রবাহে কেবলই তাহা ভাসিয়া যাইতেছিল। আজ যেন আর হাতের কাজ কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না, কেবলই সময় অপব্যয় হইতেছিল। কিন্তু আর সময় অপব্যয় করিলে চলিবে না, শুভ সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার পরই উত্তম দিন, সেই সময়েই আশীর্ব্বাদ হইবে। গবাক্ষের বাহিরে দৃষ্টি পড়ায়, সন্ধ্যার আর বাকি নাই দেখিয়া কমলরাণীর এতক্ষণে সেই কথাটা মনে পড়িল, তিনি তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া জোর করিয়া অশ্রু নিরোধ করিলেন, কন্যার দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাঁদছিস্ কেন, আজকের দিনে কি চক্ষের জল ফেলতে আছে?"

পুষ্প জড়িতকণ্ঠে বলিল, "তবে তুমি কেন কাঁদছ মা?"

কমলরাণী কাঁদিতেছিলেন।কেন, তাহা বলিতেও যে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়। যাঁহার আজ সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইত,—যাঁহার উৎসাহের পরিসীমা থাকিত না—যাঁহার আদরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা

একমাত্র কন্যার আশীর্ব্বাদ হইতেছে, তিনি যে আজ উপস্থিত নাই ; কন্যার বিবাহের কত আশা, কত আকাশ-কুসুম কিছুই না শেষ হইতেই যে তাঁহার জীবনের কাজ ফুরাইয়াছে ; তিনি যে সকল ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় কন্যার পানে চাহিয়া তাঁহার এক ফোঁটা জল চক্ষু হইতে কেমন করিয়া কি ভাবে ঝড়িয়া পড়িয়াছিল তাহা যে আজও কমলরাণীর চক্ষের উপর ভাসিতেছে। অশ্রু ছাড়া পৃথিবীতে আর যে তাঁহার কিছুই নাই, তাহা তিনি কেমন করিয়া কন্যাকে বলিবেন। কমলরাণী কন্যার কথায় কোন উত্তর দিলেন না, আদরে অঞ্চলে কন্যার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া আবার তাহাতে খোপার কাঁটার সাহায্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া চন্দন পরে পরে বসাইতে লাগিলেন। চন্দন পরান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে সহসা পুষ্প মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, এই আংটিটা ফেরত না দেওয়া আমাদের বড় অন্যায় হয়েছে।"

কমলরাণী কন্যার বিবাহ চিন্তা লইয়া অঙ্গুরীর কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—কন্যার কথায় স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয়ের নাতির কথাটাও আর একবার তাঁহার মনে পড়িল। তিনি কি ভুলই করিয়াছেন,—ইচ্ছা করিলেই রায় মহাশয়ের নাতির সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন কিন্তু ওরূপ সুবিধা সত্ত্বেও তাহাও তিনি ভ্রাতার মুখ চাহিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন আর সে সুবিধা, সে সুযোগের কোনই সম্ভাবনা নাই। সে দিনের কাণ্ডের পর হইতে তাঁহার ভ্রাতার উপর যে বিশ্বাসটুকু

ছিল, তাহাও আর নাই। তাঁহার সদাই আশঙ্কা হইতেছিল, না জানি পুষ্পের অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হইতেছিল বিধিনির্ব্বন্ধ অলঙ্ঘনীয়। যদি পুষ্পের অদৃষ্টে সুখ না থাকে, তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি তাহার কন্যাকে সুখী করেন। কিন্তু তবু তো তা মন বুঝিতে চায় না! তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও একটা প্রবল নিশ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আংটীটা যখন এতদিন ফেরত দেওয়া হয়নি, তখন আর এখন ফেরত দিয়ে কি হবে। রায় মহাশয়ের নাতি যখন আংটীটা তোকে দিয়েছে, আর যখন তুই হাত পেতে তা নিইছিস তখন আর ফেরত দেওয়া ভাল দেখায় না। এখন ফেরত দিলে তাঁরা ভাববেন আমরা তাঁদের ইচ্ছে করে অপমান করলুম। অনেক গড়িয়েছে আর ঝগড়া বিবাদে কাজ কি,—আংটীটা তোর হাতেই থাক।"

কন্যার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল,—তাহার গলার স্বর যেন কম্পিত হইল,—সে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "না মা এ আংটী আর আমি পরবো না।"

কমলরাণী কন্যার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন,—একটা তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি একেবারে নীরব হইয়া গেলেন! পুষ্প ধীরে ধীরে অখিলচন্দ্র প্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়টা যাহা এতদিন তাহার অঙ্গুলীতে ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের হস্তে প্রদান করিল। অঙ্গুরীয়টা খুলিয়া ফেলিতে কেমন যেন তাহার হৃদয়ে একটা কিসের

আঘাত লাগিল, কিন্তু আঘাতটা যে কিসের, তাহা সে বুঝিতে পারিল না,—কেবল হৃদয়ে একটা দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিল। কমলরাণী এতক্ষণ নীরবে চন্দন পরান শেষ করিতেছিলেন। তাহা শেষ করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্প তোর সঙ্গে সে দিন রায় মশায়ের না দেখা হয়েছিল, তিনি তোকে কি বল্লেন—কিছু কথাবার্ত্তা হলো ?"

পুষ্প মহা আগ্রহে বলিল, "কথা হয়নি, কত কথা হ'লো। আমি ভেবেছিলুম মা, কে না কে একজন বুড়ো। এক খানা সাদা থান কাপড় পরা,—একটা সাদা জামা গায়, মোটেই মা বোঝা যায় না যে, তিনি রায় মশায়। রায় মশায় খুব ভাল লোক —না মা ?"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; রাত্রির কৃষ্ণ অন্ধকার গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত কক্ষটাকে তাহার কোলের ভিতর টানিয়া লইতেছিল। পরিচারিকা গৃহে আলো দিয়া গেল। বহুদিন পরে কমলরাণী তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়াছিলেন। সেইগুলি একে একে কন্যাকে পরাইতে পরাইতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে রায় মশায়ের কি কথা হ'লো ?"

রায় মহাশয়ের কথাগুলি মাতাকে শুনাইতে পুষ্পের অনেক দিন হইতেই আগ্রহ ছিল, কিন্তু মাতা জিজ্ঞাসা করেন নাই কাজেই সেও বলিতে সুবিধা পায় নাই। আজ মায়ের প্রশ্নে তাঁহাকে রায় মহাশয়ের কথাগুলি শুনাইতে তাহার বেশ আনন্দ হইতেছিল। সে

আবার ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল, "আমি তাঁকে একটা বাজে বুড়ো লোক মনে ক'রে ভেবেছিলুম বুঝি পথ ভুলে বৃষ্টি ঝড়ে মন্দিরে এসে ঢুকেছে তাই জিজ্ঞাসা করলুম, বাড়ী যেতে পারবে তো, পথ ভুল হবে নাতো? তার উত্তরে তিনি বল্লেন 'চল্লিশ বৎসর বয়সে একবার চাল্‌সে ধরেছিলো, তাই ভুল করেছিলুম, এখন ছানি কেটে গেছে, আর ভুল হবে না!' এর মানে কি মা?"

কন্যার কথায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত অকস্মাৎ যেন কমলরাণীর হৃদয় মধ্যে একটা কথা দীপ্ত হইয়া উঠিল। কথাটার প্রচণ্ড উত্তাপে তাহার সমস্ত জীবনীশক্তি যেন শুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত অঙ্গটা যেন একবার কম্পিত হইল! মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন জীবন প্রদীপ একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ কমলরাণীর গত প্রাণ নির্জ্জীব আশাটা যেন একবার শেষ সজাগ হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আবার নিরাশার অন্ধকারময় কূপে ডুবিয়া গেল। তিনি আকুল আগ্রহে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল্লেন চল্লিশ বৎসর বয়সে একবার ভুল হয়েছিলো, এখন আর ভুল হবে না?"

পুষ্প মায়ের ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। সহসা মায়ের এ ভাব হইল কেন। সে বিস্মিতের ন্যায় তাহার মায়ের মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ মা, কিন্তু এ কথায় তোমার মা এমন মুখের ভাব হ'লো কেন, এর সঙ্গে তোমার কি কোন সম্পর্ক আছে?"

কমলরাণী নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিলেন। কূর্ম্ম যেমন

তাড়া পাইলে বা ভীত হইলে আপনার ভিতরেই আপনাকে লুকাইয়া ফেলে, কমলরাণীও সেইরূপ আশা নিরাশার আন্দোলনে জড়সড় হইয়া আপনার ভিতরে আপনাকে লুক্কায়িত করিলেন। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কন্যাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন সেই সময় কক্ষের ভিতর খুড়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিকৃত মুখ সর্ব্বদাই বিকৃত হইয়াই থাকিত। তিনি ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই আরম্ভ করিলেন, "বলি তোদের কি আর হবে না,—সেইতো দুপুর থেকে আরম্ভ হয়েছে, এ সাজ কি আর হয় না। ভদ্রলোকগুলো আর হা পিত্তেস্ করে কতক্ষণ বসে থাকবে। ধন্যি মা, তোদের সাজের!"

কমলরাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন খুড়ী মা, সাজানতো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। কাপড়খানা পরিয়ে দিলেই হয়। তুমি দাদাকে খবর দাও,—আমি এখনই ঝির সঙ্গে পুষ্পকে বাহিরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

খুড়ী মুখখানা আরো বিশ্রী করিয়া বলিলেন, "আর তারিণী-টারতো হুঁস্ নেই। কালবেলা, বারবেলা না পড়লেতো আর বাবুদের তাড়া হবে না। কেবল তামাকই খাচ্ছেন—মুখে আগুন, তামাক খাওয়ার।"

এখানকার কাজ সারিয়া এইবার তারিণীচরণের উদ্দেশে খুড়ী বাহির হইয়া গেলেন। কমলরাণী ব্যস্ত হইয়া পুষ্পরাণীকে কাপড় পরাইতে আরম্ভ করিলেন। মূল্যবান জ্যাকেটের উপর একখানি বহুমূল্য বেনারসী সাড়ী পুষ্পের অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিল।

পুষ্পের গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ আজ অপরূপ চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া স্বর্গের মাধুরী ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর আজ বোসেদের সমস্ত অলঙ্কার তাহার অঙ্গে উঠিয়াছে। লাল জ্যাকেটের উপর লাল বেনারসী সাড়ী সমস্ত দেহটা বেষ্টন করায় আজ পুষ্পকে ঠিক যেন একখানি জীবন্ত দুর্গা প্রতিমার মত দেখাইতে লাগিল। পরিচারিকা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পুষ্প মায়ের পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিল। কমলরাণী এক হস্তে কন্যাকে তুলিয়া অন্য হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। এক ফোঁটা অশ্রু তাঁহার নয়নের কোনে আসিয়া পড়িয়াছিল, তিনি তাহা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন। মনে মনে কন্যাকে যাহা আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা তাঁহার মনেই রহিয়া গেল, বাহিরে আর প্রকাশ হইতে পারিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন পরে আজ আবার রতন বোসের বৈঠকখানার শ্রী যেন ফিরিয়া গিয়াছে। সমস্ত ঘর জোড়া প্রকাণ্ড ভেলভেটের কার্পেট পাতা হইয়াছে। বড় বড় বেলওয়ারী ঝাড় ও দেওয়াল-গিরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বহুদিন পরে আবার তাহাদের নিজ নিজ স্থান দখল করিয়াছে। দেওয়ালজোড়া বড় বড় আয়নাগুলি ঘেরাটপ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের সোনালী হলকরা ফ্রেমের ভিতর হইতে ঝকমক করিতেছে। এমন কি বাটীর চাকর দরওয়ান পর্য্যন্ত আজ যেন মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার হইয়া, পরিষ্কার-বেশে তটস্থ হইয়া ফিরিতেছে। বিবাহটা এমনি বিচিত্র যে তাহা নিজেরই হউক বা পরেরই হউক, সংশ্রবে আসিলেই কেমন যেন আপনা হইতে চুলটা ফিরাইতে ইচ্ছা হয়,—বেশের পারিপাট্যের প্রতি অমনি যেন দৃষ্টি পড়ে।

পাত্রের মাতুল তাঁহার দলবল লইয়া প্রত্যুষের গাড়ীতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে রীতিমত চব্য-চোষ্য উদরস্থ করিয়া আশীর্ব্বাদের প্রথম সুচনাটা একটা গাঢ় নিদ্রায় জীর্ণ করিয়া আবার সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানা ঢাকাই কালা

পেড়ে ধুতি, বোধ হয় সেখানা পুত্রের আইবুড়ভাতের প্রাপ্য। বহু-বার রজকালয়ে গমনাগমন করিয়া সে লজ্জা নিবারণে একেবারেই অক্ষম ;—সর্ব্বাঙ্গে দিস্তা পড়িয়া তাহা প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করি-তেছে। পায়ে এক জোড়া সাদা হাফ্ ষ্টকিং, গায়ে একটা বেনিয়ান, তাহার দড়ির বোতামে একটা মোটা চেন ঝুলিতেছে। লোকটা পাটের দালালী করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছে, দেখিলেই বেশ পাকা লোক বলিয়া বোধ হয়। কথাবার্ত্তা যাহা কহিতেছিলেন, তাহা বেশ হুসিয়ার ভাবেই কহিতেছিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে তাম্রকূট সেবন করিতেছিল। আপ্যায়ন অভ্যর্থনায় তারিণীচরণ ব্যতিব্যস্ত। কালি ভড়ের সহিতই তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সহসা পাত্রের মাতুল কন্যার মাতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তারিণীবাবু, ব্যাপার যা শুনছি তাতে আমার মতে অন্ততঃ থানায় একটা ডায়েরী করে রাখা ভালো।"

কালি ভড় তাঁহার মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "শোন বাবাজী, এরা কল্‌কাতার লোক, এরা কি একবার বলেন, শোন। একটা টু শব্দ শুনলেই যে এরা আগাগোড়া বুঝে ফেলেন,—এদের কাছে কি আর চালাকিটি চলবার যো আছে। সেই জন্যই বাবাজী পই পই করে বলছি—এক নম্বর লাগিয়ে রাখতে ক্ষতিটা কি! কি বলেন অভয়বাবু?"

অভয়বাবু বরের মাতুল। কথাটা বলিয়াই তিনি বেশ মউজ করিয়া তামাকু টানিতেছিলেন, আকণ্ঠ ধূম ছাড়িয়া গম্ভীরভাবে

বলিলেন, "কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। একটা সর্ব্বনেশে মামলা যে বাধবে তাতো চখের উপরেই দেখতে পাচ্ছি। তখন যত শিঘ্‌গির রুজু করে দেওয়া যায়, ততই ভাল। আমার ভাগ্নে-বৌকে আসর থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে, তাতো আর আমরাও দাঁড়িয়ে দেখবো না। বাগবাজারের অভয় করের নামে কত তেহেন তেহেন বড় বড় মিঞার মুখ শুকিয়ে যায়, আর এতো একটা পাড়াগেঁয়ে, এক ছটাকের জমিদার,—বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা।"

তারিণীচরণ সবিনয়ে বলিল, "এক নম্বর রুজু করে দিতে পারলে তো আজ্ঞে ভালই হয়। কিন্তু খামকা খামকা একটা কি নিয়ে মামলা রুজু করি।"

কালি ভড় একটা বিকৃত হাসির ভঙ্গিতে মুখখানা বিশ্রী করিয়া বেশ একটু চাপা গলায় বলিয়া বসিল, "একটা চোট দেখিয়ে। বাবাজী নিতান্ত কাঁচা। বুঝলে বাবাজী, রতন আমার পর নয়, সে বেঁচে নেই, তা আর কি বলবো। রতনের স্ত্রী পরিবারের মঙ্গলের জন্য কালি ভড় কি একটু রক্তও বের করতে পারবে না। বাবাজী সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

তাহার পর পাত্রের মাতুলের দিকে ফিরিয়া বেশ একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "অভয় বাবু, কালই কাজটা শেষ করে দিয়ে তারপর কলিকাতায় রওনা হবেন। একটা কিছু না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ভাবনায় নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমুতে পারছিনে।"

এইবার বাগবাজারের অভয় করকে হটিতে হইল। তিনি

বিশুদ্ধ হাঁকাহাঁকি আস্ফালনকারী কলিকাতার পুরাতন বাসেন্দা, হাঁকাহাঁকি চেচামেচিতে মোটেই ভয় পান না, কিন্তু সেই অনুযায়ী যদি কাজ করিতে হয়,তবেই বিপদ ! কালি ভড় যে মোটে তেহাই মারিবার অবসর না দিয়া এরূপ বেয়াড়া বিশ্রী চৌদুমে তান মারিবে তাহা তাহার মোটেই ধারণা ছিল না। এ অবস্থায় ঠেকা বাঁধা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সহুরে বোল যে মফস্বলে চলে না তাহা তাঁহার খেয়ালই ছিল না। শুধু শুধু পরের জন্য দেহের খানিকটা রক্ত বাহির করিয়াও মামলা বাধাইতে হইবে—কি ভয়ানক ! তিনি কিয়ৎক্ষণ কালি ভড়ের সেই কালো মুখখানার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এটা মানুষ না অন্য কিছু। অভয় করকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কালি ভড় ভাবিল, কর মশাই তাহারই কথায় সম্মত, তাই সে তারিণী চরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাবাজী ! এই কথাই পাকা তবে হয়ে রইলো, অভয়বাবু কালই কাজটা শেষ করে দিয়ে যাবেন।"

অভয় করের আর নীরব থাকিলে শেষ একটা হাঙ্গামার ভিতর পড়িতে হয় দেখিয়া, তাঁহাকে কথা কহিতে বাধ্য হইতে হইল। তিনি আসিয়াছিলেন আশীর্ব্বাদের চোব্য-চোষ্য উদরস্ত করিতে, এমন ফ্যাসাদে পড়িবার সম্ভাবনা জানিলে কখনই তিনি একথা তুলিতেন না। কি ঝকমারিই করিয়াছেন ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমায় কি আর এ তুচ্ছ কাজে জড়ান ভাল দেখায় ! আমি আসবার সময় কলিকাতা থেকে বড় বড় এই জোয়ান—

বুঝলেন যারা পাথর বুকে ভাঙ্গে, সঙ্গে আনবো এখন। সেই বিয়ের রাত্রেই বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, কত ধানে কত চাল হয়।"

বাধিতে বাধিতেও আবার থামিয়া যায় দেখিয়া কালি ভড়ের ভিতরটা ভীষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়! একটু বিবেচনা করলেই বুঝতেন ব্যাপারটা রীতিমতই গুরুতর। বাবাজী আমাদের নিতান্ত কাঁচা, এ কাজটা আমাদের আপনাকেই উদ্ধার করে দিয়ে যেতে হবে। একটু কষ্ট হবে, তাব'লে আর করছি কি,—এতে না বল্লে আমরা কিছুতেই ছাড়ছি নি। আপনারা কলকাতার লোক আপনাদের শ্রীমুখের একটা কথা শুনতে বড় বড় জজ ম্যাজিষ্টেট ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবাজী এ পর্ব্বতের আশ্রয় কিছুতেই ছেড় না।"

কি সর্ব্বনাশ! এ যে জিউলর আটার মত কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। কালি ভড়ের কথায় অভয় কর রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তিনি একেবারে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, "ও সব হাঙ্গামাতে আমি মোটেই নেই। তা ছাড়া কাল একজন মস্ত পাটের ব্যাপারি আসবে, অনেক টাকার পাট খরিদ করবার কথা আছে, আমার থাকা কিছুতেই হ'তে পারে না। আজ রাত্রেই যেতে পারলে ভাল হ'তো, তা'রাত্রিতে গাড়ী নেই, কাজেই কাল ভোরেই যেতে হবে।"

কালি ভড় তাহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বাধা দিল, সে তাহার হাতের হুকাটা একপার্শ্বে রাখিয়া

বলিল, "সময় বুঝি উপস্থিত, বাবু মেয়েটিকে আনবার বন্দোবস্ত করুন।"

তারিণীচরণের মনটা সেই দিনের রাত্রের ঘটনাটার পর হইতেই একেবারেই মুষড়াইয়া গিয়াছিল। ভগ্নীর সম্মুখে যাইতে তাহার যেন কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কথায় সে পুরোহিত মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্টাচার্য্যি মশাই, দেখুন দেখি একবার সময়টা হ'লো কি না?"

বরের পুরোহিত ও কন্যার পুরোহিত উভয়ে একপ্রান্তে বসিয়া পরস্পর পরস্পরের মিহি হাসির সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া পরিচয় জানাজানি হইতেছিল। তারিণীচরণের প্রশ্নে কন্যার পুরোহিত তাঁহার দড়ি বাঁধা চশমাখানা নাকের উপর চড়াইয়া, পার্শ্বে রক্ষিত পাঁজিখানা তুলিয়া লইলেন, তাহার পর প্রায় দশ মিনিট কাল সে খানা নাড়িয়া চাড়িয়া অনেক হিসাব নিকাশের পর, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে এখন আন্দাজ কটা। বাজলো?"

অভয় কর তাহার বেনিয়ানের পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিলেন "আটটা বাজতে এখনও পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি আছে।"

পুরোহিত মহাশয় আবার কিয়ৎক্ষণ হিসাব করিয়া বলিলেন, "হুঁ! আড়াই দণ্ডে যখন এক ঘণ্টা, তখন আর হ'লো বই কি। সাতটা বাত্রিশ মিনিট বার সেকেণ্ড থেকে আটটা বাহান্ন মিনিট

তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। সময়টা খুব লম্বা আছে ব্যস্ত হবার কিছু কারণ নেই। তবে ক'নে আনবার বন্দোবস্ত করা এইবার দরকার বটে।"

পুষ্পকে ভিতর হইতে আনিবার জন্য তারিণীচরণ উঠিতেছিলেন, সেই সময় একখানা গাড়ী আসিয়া বোসেদের ফটকে দণ্ডায়মান হইল। পল্লীগ্রামে গাড়ীর রেওয়াজ নাই বলিলেই হয়। সহসা ফটকে গাড়ী দঁাড়াইতে দেখিয়া, গাড়ী করিয়া আবার কে আসিল জানিবার জন্য সকলেই একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। তারিণীচরণ বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দেখ তো চক্রবর্ত্তী, এই বারান্দায় থেকে উঁকি মেরে—কে এলো। রায় মহাশয়ের গাড়ী বলে বোধ হচ্চে না?"

রায় মহাশয়ের গাড়ী শুনিয়াই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বুকটা একেবারে ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল। তারিণীচরণের কথায় সে বেশ একটু ভীতভাবে গাড়ী হইতে কে নামে,—বারান্দা হইতে দেখিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল। বারান্দায় উপস্থিত হইয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সম্মুখে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার অন্তঃরাত্মা খাঁচা ছাড়িবার চেষ্টা করিল। কোন নিকট আত্মীয় ব্যক্তির মৃত চেহারাটা সম্মুখে দেখিলেও সে এত ভীত বা বিহ্বল হইত না। সে আর তথায় এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না, কোনক্রমে চক্ষু বুজিয়া বৈঠকখানার ভিতর একেবারে যেন ঝাপাইয়া পড়িয়া একটা কোন দখল করিবার চেষ্টা করিল। তাহার ভাব দেখিয়া বৈঠকখানাস্থিত সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তারিণীচরণ

মহা ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ব্যাপার কি? কে এলো?"

ভয়ে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না,—সকলের পীড়াপিড়ীতে পড়িয়া একটা অতি ক্ষীণ স্বর বাহির হইল, "রায় মশায়।"

'রায় মহাশয়' শুনিবামাত্র সকলেরই মুখ শুকাইয়া এইটুকু হইয়া গেল। তারিণীচরণের সমস্ত দেহটা তো ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এতদিনে রায় মহাশয় তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছেন,—সঙ্গে নিশ্চয়ই পাঁচ সাত শো লাঠিয়াল আসিয়াছে। আজ আর তাহার কিছুতেই রক্ষা নাই। সে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে কি জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাহার পাকস্থলী হইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকাইয়া কাট্ হইয়া গিয়াছিল। সে কি করিবে না করিবে ভাবিবারও সময় পাইল না। দ্বারের দিকে ফিরিতেই দেখিল দ্বারের সম্মুখেই গৌরীশঙ্কর রায়,—তাঁহার গম্ভীর মুখখানা আজ যেন আরোও গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে,—পশ্চাতে রসিকমোহন।

মুখে যিনি যতই আস্ফালন করুন,—সেই পক্ককেশ বৃদ্ধের সম্মুখে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, এমন সাহস,—এরূপ স্পর্দ্ধা। রামজীবনপুরের কাহারও ছিল না। সেই রায় মহাশয় সম্মুখে। ভয়ে তটস্থ হইয়া সকলকেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। কাহারও মুখে কথা নাই—সমস্ত বৈটকখানা—নীরব নিস্তব্ধ! বাগ-

বাজারের অভয় কর, রায় মহাশয়ের শক্তির ইতিহাসটা কালি ভড়ের মুখে ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। সেই রায় মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন,—তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল,—লোভে পড়িয়া আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছি। সহসা কালি ভড় দ্বারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বেশ একটু উচ্চৈস্বরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, "সেই কথাই দুশোবার বলছিলেম যে তারিণীচরণ এ কি হচ্ছে?—রায় মহাশয়ের কোপে পড়লে কি আর রামজীবনপুরে বাস কর্ত্তে পার্ব্বে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারিণীচরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরে কমলরাণীর গৃহের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে গৃহের চৌকাটের বাহির হইতেই কম্পিতকণ্ঠে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কমল! বোন্! এদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। রায় মশায় এসে পড়েছেন।"

ঠাকুর প্রণাম সারিয়া আসিয়া পুষ্প সেই সবেমাত্র মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে,—কমলরাণী অন্যমনস্কভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রাতারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সহসা ভ্রাতার স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি চমকিত হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিলেন। ভ্রাতার এই মহা ব্যস্তভাব,—পাংশুবর্ণ মুখ লক্ষ্য করিয়া দুশ্চিন্তায় তাঁহার প্রাণের ভিতরটা যেন আর একবার দুলিয়া উঠিল। সহসা তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। ভ্রাতার কথাটার অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া তিনি বিহ্বলের ন্যায় তাহার মুখের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। একটা ভয় ও আশঙ্কা যেন তাঁহার প্রাণের সমস্ত তার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হৃদয়ের ঠিক মধ্যস্থলে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিল।

'রায় মহাশয় আসিয়া পড়িয়াছেন', তখনও সেই কথাটা যেন একটা মস্ত বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া তাঁহার আসেপাশে কর্ণের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সত্যই কি রায় মহাশয় পুষ্পকে জোর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য লাঠিয়াল লইয়া তাঁহার বাড়ীতে চড়ওয়া হইয়াছেন? এও কি সম্ভব! সেই পরদুঃখ কাতর,—অনাথের জীবন,—রামজীবনপুরের প্রাণ,—যাঁহাকে গ্রামের লোক দেবতার ন্যায় ভক্তি করে,—তাঁহার দ্বারা কি এমন ঘৃণিত কাজ সম্ভব! তিনি এত হীন! এত নীচ! এ কথাটা ভাবিতেও কমলরাণীর চক্ষে জল আসিল, তিনি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! কোথায় তিনি এসে পড়েছেন? এঁ্যা তবে কি তিনি পুষ্পকে জোর করে নিয়ে যেতে এসেছেন?"

তারিণীচরণ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "তা জানিনি বোন্,—তবে তিনি এসেছেন। তিনি তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে চান। আমি তাঁকে ভেতরে আস্‌তে বলে, তোমায় খবর দিতে ছুটে এসেছি। ওই—তিনি এসে পড়লেন।"

সিঁড়িতে পাদুকার শব্দ শ্রুত হইল। কমলরাণী ভ্রাতাকে আর কোনও প্রশ্ন করিবার অবসর পাইলেন না। সত্যই রায় মহাশয় তখন একেবারে উপরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বারের অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে ভ্রাতার সেই অপরিসীম ভীতি এবং কাতরোক্তি যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই দেখিতে পাইলেন।

কক্ষের সম্মুখে আসিয়া রায় মহাশয় দাঁড়াইলেন। দ্বারের অন্তরাল হইতে কমলরাণীর দৃষ্টি সেই প্রশান্তমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। শুভ্র কেশমণ্ডিত মস্তক, শুভ্র বসন পরিহিত—বৃদ্ধের স্থবীর প্রাণটা বেষ্ঠন করিয়া যৌবনের পরিপূর্ণ লাবণ্য তাঁহার মুখশ্রীকে এখনও পরিত্যাগ করে নাই,—অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটা ধ্যান-পরতার গাম্ভীর্য্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

রায় মহাশয় দ্বারের সম্মুখে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আজ তাঁহার প্রাণের ভিতর যে ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল,—তাহার বেগ হৃদয়ের মধ্যে প্রশমিত রাখিতে যেন তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা প্রাণপাত করিতেছিল। বৃদ্ধের চঞ্চল দৃষ্টি একবার দ্বারের দিকে পতিত হইল,—তাঁহার গম্ভীর গলা হইতে একটা গম্ভীর স্বর ধীরে ধীরে নিঃসৃত হইল, "মা! আজ স্থবীর বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর রায় তার পাকা চুল নিয়ে তোমার দ্বারে অতিথি। তুমি বোসেদের কুলবধূ,—হিন্দু-কুলবধূর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবই তো মা তোমার পরিজ্ঞাত। তোমার দ্বারে এসে নিশ্চয়ই মা অতিথি কখনও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে না।"

আবেগে বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হইল,—তিনি যেন নিজেকে একটুখানি সংযত করিয়া লইবার জন্য নীরব হইলেন। কমলরাণীর কর্ণের ভিতর রায় মহাশয়ের এই সুস্পষ্ট কথাগুলি দেবতার বাণীর মত মহিমান্বিত হইয়া একে একে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল। জগৎ যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট

ছায়ালোকে পরিণত হইতেছিল। কি যেন একটা কিসের আবেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল,—নয়নে অশ্রু উছলিয়া উঠিল। তিনি নিজেকে সংযত রাখিবার জন্য দ্বারের কপাটটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া রায় মহাশয় আবার বলিলেন, "আর একদিন যখন তুমি মা এইটুকু ছিলে,—তখন আমি তোমায় আন্‌তে যায়নি বলে—অভিমান করে তাই তুমি মা আমার ঘরে যাওনি। তাই মা! আজ বুড়ো গৌরীশঙ্কর রায় তোমার দ্বারে অতিথি হয়ে, তোমার মেয়েটীকে ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছে। জানি তুমি কিছুতেই আমায় ফেরাতে পার্‌বে না,—তুমি নিশ্চয়ই কুলবধূর মর্য্যাদা রাখবে।"

রায় মহাশয়ের শুষ্ক শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া—উপস্থিত সকলের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল! হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কমলরাণীর নিরোধ অশ্রু কেবলই গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল,— তিনি নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া অশ্রু-জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "পুষ্প, রায় মশায় তোকে নিজে নিতে এসে-ছেন,—আর তো আমি না বলতে পারিনি মা। যা—রায় মশায়কে প্রণাম কর।"

পুষ্প সজ্জিত-সুন্দর-দেহে, লজ্জিত নত-মুখে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রায মহাশয়ের পদতলে হাটু গাড়িয়া বসিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। আজ আর সেই দুঃসহ লজ্জা কিংবা সঙ্কোচ তাহাকে পীড়ন করিল না। রসিকমোহন রায় মহাশয়ের সহিত ভিতরে

আসিয়াছিল,—রায় মহাশয় রসিকের দিকে ফিরিলেন। রসিক একটা বাক্স খুলিয়া একগাছি হার রায় মহাশয়ের হস্তে দিল। বহুমূল্য প্রস্তরগুলি নক্ষত্রমালার ন্যায় হারটীকে বেষ্ঠন করিয়া রহিয়াছে। রায় মহাশয় ধীরে ধীরে পুষ্পের হাত ধরিয়া তুলিলেন,—গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নবাবদের আমল থেকে বংশ-পরম্পরায় এই হার রায়েদের কুলবধূর কণ্ঠের শোভা বৰ্দ্ধন করে। বুড়োর প্রথম আশীর্ব্বাদের সহিত সেই হার এখন নাও দিদিমণি, গ্রহণ কর।"

পুষ্প অবনত হইয়া সেই বহুমূল্য হার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিল। আজ আনন্দে রসিকের গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল, সে আর নীরব থাকিতে পারিল না,—চীৎকার করিয়া বলিল, "এ সময় খুড়ী কোথায় গেলেন গো—শাঁখটা একবার বাজাও না!"

ঠিক সেই সময় শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিচে ক্রমাগত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।